মানুষের মন

অরুণকুমার রায় চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

মানুষের মন

(বিশেষ ভাবে ফ্রয়েডীয় মনো সমীক্ষার আলোকে)

ডাঃ অরুণ কুমার রায়চৌধুরী এম. বি., এম. এস. সি.

মেডিকেল কলেজের স্নায়ুতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব সহ-অধ্যাপক ;
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের মনোবিজ্ঞানের
পার্টটাইম অধ্যাপক ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

MANUSHER MON
Dr. Arun Kumar Ray Chaudhury

প্রকাশকাল :
প্রথম মুদ্রণ—অক্টোবর, ১৯৮২
দ্বিতীয় মুদ্রণ—জুন, ১৯৮৮

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন, (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক—
দীপ্তি প্রিন্টার্স
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

প্রচ্ছদ :
বিমল দাস
দুর্গা রায়

মূল্য : পাঁচ টাকা

Published by Sri Sibnath Chatterjee Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education). New Delhi.

সূচীপত্র

ভূমিকা

মানুষের মনের বিকাশকে বয়স অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এ প্রবন্ধমালার মধ্যে শিশুর মনের বিকাশ, তরুণ তরুণীর মনের প্রকাশ, বয়স্ক লোকের মনের প্রকাশ, বৃদ্ধের মনের প্রকাশ প্রভৃতির বিশেষত্বকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে ফ্রয়েডের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে।

বিভিন্ন বয়সের মানুষের মনের প্রকাশের সঙ্গে জড়িত তার বিভিন্ন সমস্যা। একটি মানুষকে সামগ্রিক ভাবে জানতে হলে তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পূর্ণবয়স, ও বার্ধক্যে যে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার, সেই প্রয়োজনেই এই প্রবন্ধমালা।

এই পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ের লেখাগুলি প্রবন্ধাকারে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে সেগুলিকে একত্রে পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হ'ল।

অনুসন্ধানী পাঠকের ঔৎসুক্য যদি এসব প্রবন্ধে কিছু নিরসন হয় এবং এ বিষয়ে জানবার জন্য তাদের কৌতূহল আরো যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

মহালয়া, ১৯৮২

গ্রন্থকার

শিশু মনের স্বাস্থ্য—মনের বিকাশের ধারা

(ফ্রয়েডীয় মনঃ সমীক্ষার আলোতে)

শিশুর জন্মের পর ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে তার মন বিকশিত হয়ে ওঠে।' মনঃসমীক্ষা বা Psychoanalysis শিশু মনের এই ক্রমবিকাশের ধারাকে লিবিডো ডেভলপমেন্ট (libido development) বলে আখ্যা দিয়েছে। কোন মানুষই মনের সম্পূর্ণতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে না। সময়ের সাথে সাথে ও পরিবেশের প্রভাবে ধীরে ধীরে এই মন সম্পূর্ণতা লাভ করে। শিশুর মনের এই পূর্ণতা আসতে ফ্রয়েডীয় মতবাদ অনুসারে প্রায় ১৫।১৬ বছর লাগে, আর এই প্রথম ১৫।১৬ বছরের মধ্যে প্রথম পাঁচটা বছরের প্রভাব প্রত্যেক মানুষের পরবর্তী জীবনের উপর অত্যন্ত বেশী, এমন কি মানুষের জীবনের ভবিষ্যৎ প্রায় এই প্রাথমিক পাঁচ বছর দিয়েই বহুলাংশে নির্ণীত হয় বলে মনঃসমীক্ষা বিশ্বাস করে। এই জন্য শিশুর এই প্রাথমিক পাঁচ বছর যাতে ভাল ভাবে গ'ড়ে ওঠে সে বিষয়ে মা, বাবা, ও পারিবারিক আর সকলের বেশ যত্নশীল হওয়া উচিত। কেবল মানুষগুলিই নয় পারিপার্শ্বিক আর সব কিছুর প্রভাব এ সময়ে খুব বেশী, সে কারণে শিশুর পরিবেশকেও সুপরিকল্পিত ভাবে সহায়ক ক'রে তোলা বাঞ্ছনীয়।

মনের ক্রম বিকাশের ধারা —

(১) প্রথমে শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখনকার মনের অবস্থাকে বলা হয় Auto-erotic stage—আত্মকেন্দ্রিক বা আত্মকামুক অবস্থা।

(২) তার পরের অবস্থাকে বলা হয় Narcissistic stage—আত্মপ্রেমের অবস্থা।

(৩) তৃতীয় অবস্থায় শিশু প্রথমে স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য সম্বন্ধে বুঝতে আরম্ভ করে এবং এই অবস্থায়ই শিশুর মনের মধ্যে দেখা দেয় oedipus complex—ঈডিপাস কম্প্লেক্স্ অর্থাৎ শিশু পিতা মাতার মধ্যে যে তার সমলিঙ্গী সে তার জীবন পথ থেকে যাতে সরে যায় তাই আকাঙ্ক্ষা করে, যাতে তাদের মধ্যে যে তার বিপরীত লিঙ্গীয় তাকে সম্পূর্ণ ভাবে সে তার নিজের

ক'রে পেতে পারে। ফ্রয়েডের মতে ঈডিপাস কম্প্লেক্সের প্রভাব মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সব জীবনকেই প্রভাবিত করে। এমনকি সভ্যতার বিকাশ, ধর্মের প্রকাশ, আর্ট (art), কাব্য, প্রভৃতির গোড়াপত্তনও এই oedipus complex-এর দরুন।

(৪) চতুর্থ পর্যায়ের অবস্থাকে বলা হয় Lateney period—ছয় থেকে নয় বৎসর ধরে চলে এই অবস্থা। এ সময়ে শিশু অনেক শান্ত হয়ে যায়। সে পিতা মাতার মন জুগিয়ে চ'লতে চায়, তাদের কাছে সম্পূর্ণ বাধ্য ও আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে – কোন কারণেই তাদের প্রতি বিদ্রোহের ভাব বা অবাধ্যতা দেখায় না।

(৫) পঞ্চম অবস্থা। দুঃখের বিষয়ে যে Lateney period-এর শান্ত অবস্থা বেশী দিন থাকে না। প্রকৃতির নির্দিষ্ট পথে শরীর ও মনে দেখা দেয় কৈশোরের পরিবর্তন। বিভিন্ন অন্তঃরস সঞ্চারী গ্রন্থি (Endocrine) সমূহ থেকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত পরিমাণে রস বা হর্মোন নিঃসরিত হতে আরম্ভ করে, এরই ফলে এই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে প্রত্যেকের মনেই দেখা দেয় স্বপ্নের আবেশ ও ভাবের জোয়ার। নিজেকে আর যেন নিজের মধ্যে ধ'রে রাখা যায় না – তার মন চায় মুক্ত ঝর্ণাধারার মত কল কল ক'রে বেয়ে চ'লতে। অথচ নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় কোথা থেকে কেমন ক'রে তার মনের ভিতরে এই অদ্ভুত পরিবর্তন আসছে। নিজেকে মনে হয় অসীম শক্তির অধিকারী ব'লে, মনে হয় সে বুঝি সব কিছুই ক'রে তুলতে পারবে। আর এরই সঙ্গে চ'লতে থাকে দিবাস্বপ্নের অভিযান। রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মধ্যে মনের এই অবস্থাই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থাকে ফ্রয়েডীয়গণ বলেন stage of storm and stress—একদিকে ঝড়ের দোলা চ'লতে থাকে মনের অন্দরে কন্দরে আর চলতে থাকে তারই চাপ—সে বুঝতে পারে না মনের এই অসীম সক্রিয়তার উদ্দেশ্য কি?

(৬) পরের অবস্থাকে বলা হয় Secondary Narcissistic অবস্থা—হঠাৎ যৌবনোচিত শারীরিক পরিবর্তনগুলি, যেমন পুরুষের গোঁফ দাড়ি গজান, শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুল গজান, স্বরভঙ্গ হওয়া, নৈশ স্খলনের আবির্ভাব, শরীরের মাংস পেশী সমূহ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়ে দেহের পুরুষোচিত অভিব্যক্তি, অপর দিকে নারীর দেহে দেখা দেয় যৌবনোচিত কমনীয়তা ও

সৌন্দর্য, লাজুকতা, বক্ষদেশে দেখা দেয় নারীসুলভ পরিবর্তন আর এরই সঙ্গে দেখা দেয় নারীর মাসিক ঋতুস্রাব। এসকল পরিবর্তনের জন্য দায়ী অন্তঃরস সঞ্চারী গ্রন্থিরস বা hormone, বিশেষ ক'রে স্ত্রী ও পুরুষের যৌনগ্রন্থিরস সমূহ।

আশ্চর্য হয়ে পুরুষ চায় তার দেহের দিকে—শরীরে এ সব পরিবর্তন কেনই বা আসছে, এর প্রয়োজনই বা কি? নারীর চোখে দেখা দেয় পরম জিজ্ঞাসা, এসব পরিবর্তন কি হচ্ছে? ক্রমশ উভয়েই সচেতন হয়ে ওঠে তাদের নিজের নিজের দেহের প্রতি—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তারা দেখতে চায় জানতে চায় দেহের কোথায় কি পরিবর্তন হ'ল। দ্বিতীয় বার তারা নিজেরাই যেন আবার নিজেদের আবিষ্কার করে। নিজেদের দেহ ঘিরেই তখন চলতে থাকে তাদের প্রেম অভিসার। নিজেদেরই নিজেরা তখন ভালবেসে ফেলে, নিজেদেরকেই কেন্দ্র ক'রে তখন চ'লতে থাকে তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নবিলাস। সে যেন আপনাতে আপনি মগ্ন হয়ে থাকতে চায়।

(৭) সপ্তম অবস্থা—এ অবস্থায় সমলিঙ্গীর প্রতি এক আকর্ষণ দেখা দেয় অর্থাৎ বালকেরা চায় সম বয়স্ক অপর সব বালকের সঙ্গ, আর বালিকারাও সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা করে অপর সব বালিকাদের সঙ্গ। ফ্রয়েডীয়গণ এই অবস্থাকে Stage of Homosexualis ব'লে আখ্যা দেন। ফ্রয়েডীয়দের মতে তখন তরুণ-তরুণীদের নিজেদের মধ্যে যে club, association, সভা, সমিতি, আড্ডা, আখড়া গ'ড়ে তুলবার যে একটা প্রচণ্ড বাসনা ও কামনা তার পেছনে রয়েছে এই সমলিঙ্গীয় আকর্ষণ। মনঃসমীক্ষা মনে করে যে প্রত্যেক পুরুষ ও মেয়েদের মধ্যেই এই প্রেরণা কম বেশী বর্তমান থাকে তারই ফলে সমাজে দেখা দেয় সঙ্গ স্পৃহা এবং এরই ফলে সম্ভব হয় universal brotherhood বা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি।

(৮) অষ্টম অবস্থাতেই পুরুষ বা নারী তার চরম লক্ষ্যে পেঁছায়। ফ্রয়েড এই অবস্থাকে বলেন Stage of Heterosexualis। এই অবস্থায় প্রকৃতি যেন প্রত্যেক তরুণ তরুণীর চোখে মায়া কাজল পরিয়ে দেয়। তরুণের চোখে তরুণী মাত্রেই পরম বিস্ময়। অজানা এক আকর্ষণে তরুণ তরুণীর দিকে আকৃষ্ট হয়, তার প্রেম, ভালবাসা, সঙ্গ কামনা করে। তাকে নিজের ক'রে, একান্ত ভাবে আপনার ক'রে পেতে চায়—তার ভিতর থেকে নিজেকে

আবার নতুন করে সৃষ্টি ক'রতে চায়।

তরুণীর চোখে তরুণ এক চিরন্তন জিজ্ঞাসা। মনের গভীর থেকে কি যেন আকর্ষণের টান সে অনুভব করে অথচ সমাজ তরুণীর জীবনকে অনেক সীমায়িত করেছে তার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণকে সে জন্য তার ঢেকে রাখতে হয় সরমের আবরণে, অথচ নারীর যে অলঙ্কার, যে সাড়ি টয়লেটের জৌলুস তার লক্ষ্য তরুণের দৃষ্টি একবার তার দিকে পড়ুক। সমস্ত তরুণীর মধ্যে তাকেই যেন শ্রেষ্ঠ তরুণী হিসাবে তার বাঞ্ছিত তরুণ স্থান দেয়। তার মনে তখন দেখা দেয় ঘর বাঁধার এক মধুর স্বপ্ন, মনের অন্দরে চ'লতে থাকে কল্পনা দিয়ে গড়া ভবিষ্যৎ মিলিত-জীবনের ঘরকন্নার ছবির পর ছবি।

স্বাভাবিক এই মনবিকাশের পর্যায়গুলির পথে অনেক সময় বাধা আসে, তখন আর সে মন সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। অপরিণত মনে দেখা দেয় নানা প্রকারের রোগ অথবা বিকৃতি। তখন প্রয়োজন হয় মনোচিকিৎসকের উপদেশ ও নির্দেশের।

শিশুর মনজীবনে ঈডিপাস গূঢ়ৈষার (Oedipus complex-এর) বা ইলেকট্রা গূঢ়ৈষার (Electra complex-এর) ভূমিকা ঃ

মানব সন্তানের মনোবিকাশের ধারাকে ফ্রয়েড বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেন, এবং তৃতীয় স্তর থেকে ঈডিপাস গূঢ়ৈষার (Oedipus complex-এর) অথবা ইলেকট্রা গূঢ়ৈষার (Electra complex-এর) স্তর নামে অভিহিত করেন।

ফ্রয়েড নিজে মনে করেন যে এই তৃতীয় স্তরের অর্থাৎ ঈডিপাস বা ইলেকট্রা গূঢ়ৈষার, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজ জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা, এবং তিনি নিজে ঈডিপাস গূঢ়ৈষাকে মনঃসমীক্ষার ভিত্তি প্রস্তর বা Corner stone বলে আখ্যা দেন। এ কারণে মনোবিকাশের এই তৃতীয় অবস্থাটি একটু বিস্তৃত বর্ণনার দাবী রাখে। মনঃ সমীক্ষা কেন্দ্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় ফ্রয়েড লক্ষ্য করেন যে ২ থেকে ৫ বছর বয়োপ্রাপ্ত শিশু, প্রথমে স্ত্রী পুরুষের লিঙ্গভেদ সম্বন্ধে বুঝতে আরম্ভ করে ও সে স্ত্রী পুরুষের মধ্যেকার বিভেদ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে ওঠে। এ বয়সের শিশুর মনে এক বিশেষ জটিল অবস্থার প্রকাশ হয়, ফ্রয়েড ছেলেদের বা পুং সন্তানের ক্ষেত্রে একে ঈডিপাস গূঢ়ৈষা ও মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে একে ইলেকট্রা গূঢ়ৈষা বলে অভিহিত করেন।

ফ্রয়েডের মতে ২ থেকে ৫ বছর বয়সের পুং সন্তান হয় পিতার প্রতি অসূয়া সম্পন্ন, বিরূপ ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, এমন কি পিতার মৃত্যু পর্যন্ত সে আকাঙ্ক্ষা করে এবং মায়ের প্রতি আসক্তি অনুভব করে, মাকে ভালবাসতে চায় এবং পিতাকে সরিয়ে দিয়ে মাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের করে পেতে চায়। সে চায় মায়ের দেহ ও মনের সম্পূর্ণ একক অধিকার। পৌরাণিক ঈডিপাস মিথ (Myth) বা ঈডিপাস নাটকের অনুকরণে ফ্রয়েড পুং সন্তানের মনের এই বিশেষ জটিল অবস্থাকে ঈডিপাস গূঢ়ৈষা বলে চিহ্নিত করেন। তেমনি আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে তিনি ইলেকট্রা গূঢ়ৈষার অবতারণা করেন। তিনি বলেন

২ থেকে ৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা সন্তান মায়ের প্রতি অসূয়া, বিরূপতা ও বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে, এমন কি মনের মধ্যে মায়ের মৃত্যু কামনা পর্যন্ত করে,যাতে মাকে সরিয়ে দিয়ে পিতাকে সে একান্ত ভাবে নিজের করে পেতে পারে। মেয়ে চায় পিতার নিবিড় সঙ্গ, দেহ ও মনের সম্পূর্ণ একক অধিকার।

কিন্তু ৪টি বিশিষ্ট কারণে, সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঈডিপাস গূঢ়ৈষা বা ইলেকট্রা গূঢ়ৈষা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না, ধীরে ধীরে এরা পুং বা মেয়ে সন্তানে মনোজীবন থেকে মিলিয়ে যায়। একে ফ্রয়েড বলেন Resolution of oedipus complex বা electra complex, অর্থাৎ ঈডিপাস গূঢ়ৈষা বা ইলেকট্রা গূঢ়ৈষার সুস্থ সমাধান।

যে ৪টি কারণ ঈডিপাস গূঢ়ৈষা বা ইলেকট্রা গূঢ়ৈষার মিলিয়ে যাওয়ার বা সুস্থ সমাধানের মূলে সেগুলি হচ্ছে :

(i) দৈহিক পূর্ণতার দিক থেকে শিশু সম্পূর্ণ অপুষ্ট বা immature, সে কারণে সে দৈহিক দিক থেকে পূর্ণ বয়স্কের ভূমিকা গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

(ii) মনের দিক থেকে সুস্থ পিতা বা মাতা, দুজনের একজনও শিশুর এই অস্বাভাবিক ও গর্হিত ইচ্ছার পোষকতা বা অনুমোদন করেন না বরঞ্চ সর্বপ্রকারের শাসন, উপদেশ ও তিরস্কারের মাধ্যমে শিশুর মন থেকে এ অনভিপ্রেত ইচ্ছাকে দূর করে দেবার সর্ববিধ চেষ্টা করেন। অঙ্কুরেই যাতে এর বিনাশ হয় তাই করেন।

(iii) সভ্য দেশের সামাজিক অনুশাসন ও নৈতিক ব্যবস্থাও এর সম্পূর্ণ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

(iv) ফ্রয়েড ঈডিপাস গূঢ়ৈষার সমাধানের চতুর্থ কারণ হিসাবে শিশুর উপস্থ ছেদ গূঢ়ৈষা (Castration complex) বা লিঙ্গ ছেদের ভীতি ও আতঙ্ককে নির্দেশ করেন। তিনি মনে করেন যে শিশু লিঙ্গচ্ছেদের ভয় ও আতঙ্কে আর তার সমাজ বিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার পথে এগিয়ে যায় না।

উপস্থ ছেদ গূঢ়ৈষার বা Castration complex-এর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও পরিচয় এখানে দেওয়া দরকার বিধায় নিচে এ বিষয়ের উল্লেখ করা গেল।

ফ্রয়েড ও এডাম স্মিথ (Adam Smith) মনে করতেন যে আদিম সমাজ ব্যবস্থায়, অর্থাৎ মানব সমাজের উন্মেষ কালে, একটি পুরুষ, একদল নারীকে

নিয়ে বাস করত। দলের ঐ পুরুষটিকে বলা হত দলপিতা বা Horde father, আর তাঁর সঙ্গের মেয়েদের তাঁর হারেম (Harem) বলে চিহ্নিত করা হত। দলপিতা তাঁর হারেমের যূথপতি ও সর্বময় কর্তা হতেন, এবং তিনি সর্বদা সাবধান ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যাতে তার হারেমে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন পুরুষ না প্রবেশ করতে পারে।

যখন এ সব হারেমের কোন মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হত, ও কোন পুং সন্তানের জন্ম দিত, তখন দলপিতা, প্রথম দিকে, অতি নিষ্ঠুর ভাবে সে সব ছেলেকে মেরে ফেলে ভবিষ্যৎ যৌন প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে রেহাই পেতেন। কিন্তু পরে হারেমের মেয়েদের অনুরোধ, উপরোধ ও কাকুতিতে বাধ্য হয়ে দলপিতা নবজাতক পুং সন্তানদের আর প্রাণে মারতেন না, কিন্তু তাদের পুরুষাঙ্গ ছেদন বা উপস্থ ছেদন (Castration) করে এদের খোজায় পরিণত করে, ভবিষ্যৎ যৌন প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনভিপ্রেত সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিতেন। ফ্রয়েড মনে করেন যে ঐ আদিম দিনের দলপিতা কর্তৃক সন্তানের উপস্থ ছেদন এমনই একটি বিশিষ্ট মানসিক অভিঘাত (Mental Trauma), যে তার অভিজ্ঞতার ভয় ও আতঙ্ক আজও প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, পাকাপাকি ভাবে আঁকা হয়েছে।

ফ্রয়েডের উপস্থ ছেদন গদ্‌গ্রৈষা বা Castration complex-এর এই মতবাদ কিন্তু আধুনিক জৈব বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়—কেননা কোন পুরুষের নিজস্ব জীবদ্দশায় অর্জিত কোন গুণ বা বিশেষত্ব (acquired character trait) পরপুরুষে বর্তায় না।

তবে সর্বদিক রক্ষা করার জন্য, উপস্থ ছেদন গদ্‌গ্রৈষার (Castration complex-এর) বিকল্প হিসাবে বলা যায় যে শিশুর মনের লিঙ্গ ছেদের ভয় বা আতঙ্কই তার অবাঞ্ছিত কামনা বাসনার ছেদ টানে। শিশু ভয় পায় যে তার অশুভ ইচ্ছার শাস্তি হিসাবে পিতা তার উপস্থ ছেদ বা Castration করতে পারেন, এরকমের ভয় বা আতঙ্কই শিশুর অন্যায় ইচ্ছার অন্তরায় হয়ে ওঠে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে উপস্থ ছেদের গদ্‌গ্রৈষা বা Castration-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ফ্রয়েড বলেন যে মেয়েরা উপস্থ ছেদের গদ্‌গ্রৈষা থেকে ভুগতে আরম্ভ করে, প্রথমে যখন তারা স্ত্রী পুরুষের লিঙ্গ ভেদ আবিষ্কার করে এবং দেখতে

পায় যে তারা উপস্থহীন। ফ্রয়েড আরো বলেন যে মেয়েরা মনে করে যে শৈশবাস্থায় কেউ (বিশেষ ভাবে তার মা) তার উপস্থ ছেদন করেছেন। উপস্থ হীনতা জনিত, মেয়েদের মনের গভীরে সর্বদাই আতঙ্ক, চাঞ্চল্য ও ঈর্ষার সৃষ্টি হয়।

উপরের ঐ চারটি কারণে শিশুর মন থেকে ঈডিপাস গদ্রৈষা বা ইলেকট্রা গদ্রৈষা মিলিয়ে যাওয়ার ফলে শিশুর মনে বিশেষ কয়েকটি পরিবর্তন দেখা যায় :—

(i) শিশু পিতা বা মাতার সঙ্গে বহুলাংশে একাত্ম (Identification) বোধ করে। পিতা, মাতার সঙ্গে এই একাত্ম বোধ ভবিষ্যৎ জীবনে, শিশুর প্রেম জীবন, সমাজ জীবন, যৌন জীবন ও ব্যবহারিক জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করে।

(ii) দ্বিতীয়তঃ ভস্মীভূত ও মিলিয়ে যাওয়া ঈডিপাস গদ্রৈষা বা ইলেকট্রা গদ্রৈষার ভিতর থেকেই অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে অধিশাস্তা বা Super Ego। শিশুর মনে দেখা দেয় ন্যায় নীতি বোধের প্রাথমিক বীজ।

অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু পিতা মাতার অবিমৃষ্যকারিতা বা বোকামির ফলে, অথবা দূষিত সামাজিক বা পারিবারিক **পরিবেশের** কারণে ঈডিপাস গদ্রৈষা বা ইলেকট্রা গদ্রৈষা শিশুর মন থেকে মিলিয়ে যেতে পারে না, এতে এসব শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন দাম্পত্য জীবনে, কর্ম জীবনে, পারস্পরিক সামাজিক জীবনে দেখা দেয় নানা প্রকারের জটিল সমস্যা।

উপসংহারে বলা উচিত যে ফ্রয়েডের ঈডিপাস গদ্রৈষা বা ইলেকট্রা গদ্রৈষা সম্বন্ধীয় মতবাদ একটি প্রকল্প বা Hypo hesis মাত্র, একে কোন ক্রমেই একটি প্রামাণিক সূত্র বা Proven law হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

ফ্রয়েডীয় ঈডিপাস গদ্রৈষা প্রকল্পের বা Hypothesis-এর সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য বহু আলোচনা, সমালোচনা ও গবেষণা হয়েছে। তাদের মধ্যে ফ্রয়েডের এককালীন সহকর্মী, এডলার (Adler) ইয়ুং (Jung) প্রভৃতি যেমন আছেন, তেমন পরবর্তী মনঃসমীক্ষকগণ যেমন ফ্রোম (Fromm) প্রভৃতিও আছেন, তাছাড়া এ বিষয়ে নৃতাত্ত্বিক (anthropological) আলোক পাত করার জন্য ম্যালিনওস্কি (Malinowski), মিড (Mead) প্রভৃতিও এদের বহু অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করেছেন। এদের অনেকে ঈডিপাস গদ্রৈষার

সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু এ সকল বাদানুবাদ সত্ত্বেও ফ্রয়েডের এই প্রকল্প বা Hypothesis-কে হেলা করা সম্ভব নয়, কারণ এরই মাধ্যমে মানুষের সামাজিক, নৈতিক, ব্যক্তিগত, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও কৃষ্টিগত বহু প্রতিষ্ঠান (Institution), ও ব্যবস্থায় সুষ্ঠু ও সুন্দর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব। এমন কি সভ্যতার বিকাশ, ধর্মের প্রকাশ, আর্ট (Art) কাব্য প্রভৃতির বিষয়ও এ প্রকল্প (Hypothesis) বিশেষ ভাবে আলোক পাত করতে সক্ষম একথাও ধ্রুপদী (classical) ফ্রয়েডীয়া প্রচার করেন।

শিশু-মনের স্বাস্থ্য—অহং বোধের ইতিকথা

আমিত্ব বা Ego নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আসে না—জন্মক্ষণে এবং তার বহুদিন পর পর্যন্ত মানুষের নিজের সম্বন্ধে অপর সব বস্তু থেকে সে যে আলাদা সে ধারণা দেখা দেয় না। প্রথমে শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মনে হয় যে সেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রয়েছে।—অহং ও অদস (objective and subjective world) তখন অভিন্ন অবস্থায় বিরাজ করে। ফ্রয়েড বলেন জন্মক্ষণে শিশু জন্মায় oceaning feeling নিয়ে, সমুদ্রের ন্যায়ই সে সীমাহীন। ক্রমশ: ক্রমশ: শিশুর মনে অহংবোধ বা আমিত্ব দানা বেঁধে উঠতে থাকে—কেমন করে এই অহংবোধ, আমিত্ব দানা বেঁধে উঠে, নিচে তারই বিস্তৃত আলোচনা দিলাম।

হিন্দু শাস্ত্র বলে নাম ও রূপ দিয়েই প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যক্তি চিহ্নিত এবং অপর সকল ব্যক্তি থেকে তাকে আলাদা করে নেয়া যায়, এই নাম এবং রূপের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে প্রত্যেকের স্বকীয়তাবোধ বা অহংবোধ। আমি যে সকলের চেয়ে আলাদা সে আমার স্বকীয় দেহ দ্বারাই প্রকাশ পায়—সে দেহের চারদিক ঘিরে রয়েছে চামড়ার আবরণ—এবং সেই চামড়ার আবরণই প্রত্যেক বিভিন্ন মানুষকে সমগ্র পৃথিবী থেকে আলাদা করেছে। এর পরে যখন "নাম করণ" হলো তখন ত বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজের কাছে ও পরিবারের কাছে তার আলাদা পরিচয় পেল। কিন্তু মনের দিক থেকে অহংবোধের কি করে সৃষ্টি হল, স্বাভাবিক ভাবেই আপনাদের মনে নিশ্চয়ই সে প্রশ্ন জাগবে।

মনের দিক থেকে আমিত্বে'র বা Ego-র ক্রম বিকাশের ধারা সত্যই বেশ কৌতূহল উদ্দীপক।

ফ্রয়েড বলেন প্রত্যেক মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ID বা অদস নামক মনের বিশিষ্ট অংশ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সকল ব্যক্তিরই ID বা অদস একই গুণাবলীর সমষ্টি দিয়ে তৈরী। রাম, শ্যাম, যদু, মধু, সীতা, সাবিত্রী, সরমা, পুতনা, সকলেই Identical ID বা সমতুল্য বা একই রকমের অদস নিয়ে

জন্মগ্রহণ করে—তারপর ধীরে ধীরে এই অদস বা ID থেকেই অহং বা Ego দানা বেঁধে গড়ে উঠতে থাকে। প্রত্যেক নর-নারীর ভেতরে যে পশু-শক্তি রয়েছে ID বা অদস তারই আধার। ID বা অদস নর-নারীর ভেতরের পশু-শক্তিটা চায় আনন্দ, সুখ, তার কাছে ন্যায়, ধর্ম বা বাস্তবের কোনপ্রভাবই নেই—সে কারণে ফ্রয়েড বলেন যে ID কেবলমাত্র pleasure principle দ্বারাই চালিত অর্থাৎ ID বা অদস সুখাশ্রয়ী। মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা হিংসা দ্বেষের বাসস্থল মনের এই অংশ। মনঃসমীক্ষক সে কারণেই এই পশু শক্তির আধারকে বলেন অন্ধ শক্তি, তারা বলেন ID is blind।

ID বা অদস থাকার জন্য প্রত্যেকের প্রাণসত্তা সঞ্জীবিত থাকে। প্রত্যেক শিশুই তার খাদ্য পাবার দাবীতে ক্রন্দন করে এবং খাদ্য পেলে শান্ত হয়। কিন্তু খাদ্যের প্রাথমিক উৎস হচ্ছে মা—শিশু প্রথম অবস্থায় তার অহংবোধ না থাকায় সে যে মা থেকে আলাদা তা বুঝতে পারে না—কিন্তু যখন শিশুর মনে ও দেহে খাদ্যের চাহিদা দেখা দেয় অথচ মা কাছে নাই তখনই শিশু প্রথম বুঝতে পারে যে মা থেকে সে সম্পূর্ণ এক পৃথক সত্তা। ধীরে ধীরে শিশু তার ব্যথা, বেদনা, দুঃখ, কষ্ট সকলই যে তার স্বকীয় কষ্ট ব্যথা এবং কেবল তারই দেহ থেকে উৎপন্ন হচ্ছে তা বুঝতে আরম্ভ করে—ধীরে ধীরে তার নিজের দেহকে কেন্দ্র করেই তার মনের ভেতরে অহংবোধ দানা বাঁধতে আরম্ভ করে।

এছাড়া শিশুর চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ও চর্ম এ সকল ইন্দ্রিয়, তাকে বাইরের পৃথিবীর সব কিছুকে গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এ সকল ইন্দ্রিয়কে এক কথায় বলা হয় Receiving apparatus বা বহিঃ পৃথিবীর যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহকে ধরবার যন্ত্র। এই রূপেই বাইরের পৃথিবীর একটা দাবি ধীরে ধীরে শিশু মনে গেঁথে যায়। শিশু সমগ্র পৃথিবীকে এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুসমূহকে নিজ থেকে আলাদা বলে বুঝতে পারে, সে বুঝতে পারে যে সে বিরাট পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্র একটি চিহ্নিত জীবিত প্রাণী মাত্র—অন্য সকল বস্তুর তারই মত আলাদা স্বকীয় অস্তিত্ব বর্তমান—তবে তার বিশেষত্ব এই যে সে কেবল জীবিত নয় চেতনশীলও বটে। এবং এই চেতনশীলতারও আবার দুটি অংশ ধীরে ধীরে তার কাছে ধরা পড়ে। সে বুঝতে পারে পৃথিবীর অন্য সকল বস্তু সম্বন্ধে সে যেমন সচেতন, তেমনি তার নিজের মনের

মধ্যে কখন কি ঘটে যাচ্ছে সে সম্বন্ধেও সে সচেতন অর্থাৎ সে আত্ম চেতন বা self conscious। একই কালে সে কর্ম-কর্তা অর্থাৎ কাজ করে যাচ্ছে এবং সেই সময়ই তার কাজের ফলে যে দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, স্ফূর্তি দেখা দিচ্ছে তার ভোক্তাও বটে। অর্থাৎ নিজের মনের মধ্যে কি না হচ্ছে তাও সে উপলব্ধি করতে পারছে। তার নিজের মনের মধ্যে যে পরিবর্তন আসবে তা বাইরের আর কোন কেউই প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারবে না—কেবলমাত্র আন্দাজ করতে পারে মাত্র। একজনার মনের আনন্দ, সুখ, ব্যথা, তার চাপা বেদনা সেই নিজে কেবলমাত্র বুঝতে পারছে অন্যে কেবলমাত্র আন্দাজ করতে পারে মাত্র। কিন্তু অপর কারোরই এমন কোন ইন্দ্রিয় বা যন্ত্র নেই যা দিয়ে অন্যের মনের সঠিক পরিচয় বা জ্ঞান লাভ করতে পারে। আন্দাজে অনেকটা এবং যখন সেই বিশেষ মানুষটি মুখ ফুটে তার অন্তরের সুখ দুঃখের আশা আনন্দের কথা বলে তখন তার কথা দিয়ে তার মনের কথা বুঝতে পারে। তবে এই কথা শুনে অপরের মনের অবস্থা বোঝাতেও একটা বিপদ আছে—বক্তা যে সব সময় সত্য কথা বলবেন তা বোঝবার তো কোন উপায় নেই। বক্তা যদি তার মনের দুঃখ, ব্যথা, তাপ, চাপ, আনন্দ, স্ফূর্তির কথা অস্বীকার করেন—বক্তা যদি একজন পারদর্শী actor বা অভিনেতা হন তবে তো অনায়াসেই তার নিজের মনের অবস্থা চেপে যেতে পারেন। এই সুবিধা আছে বলেই সমাজ ও সংসারে গোপনীয়তার সম্ভব হয়েছে এবং অনেক প্রকারের ভুল বোঝাবুঝিও হচ্ছে। কারণ আমরা প্রত্যক্ষভাবে আমার নিজের অর্থাৎ অহং-এর বা Ego মনের কথাই জানি অপর সকলের মনের কথাই আমার নিজের বিচারে ঐরূপ পরিবেশে ও অবস্থায় মনের কিরূপ পরিবর্তন হওয়া উচিত—অপরের মনের ঐরূপ পরিবর্তন ধরে নেই মাত্র।

মানুষের অহংবোধ ধীরে ধীরে বয়স বাড়বার সঙ্গে বেড়েই চলে—স্মৃতির পটে সময়ের তুলির দাগে কতই না বিচিত্র ঘটনার দাবি অঙ্কিত হয়। প্রত্যেক স্মৃতির পট বা (Memory) কিন্তু আলাদা আলাদা কারো সঙ্গে কারোই সম্পূর্ণ Identical বা একাকার নয়। এই স্মৃতির সামগ্রিকতা দিয়েও বিভিন্ন অহং বা Ego চিহ্নিত এবং পরিচিত। এই স্মৃতির পটে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন দাবি এসে জোড়া লাগে—অতিতের অভিজ্ঞতা, অতীতের আহরিত জ্ঞান হয় সংযোজিত—অহং-এর পরিধিও তেমনি বেড়ে যায়।

একটি জটিল সমস্যা (Problem) হল মানুষের মৃত্যুর পর অহংবোধ বা Ego-র কি হয়। পুরাণ শাস্ত্র ও ধর্ম পুস্তকাদিতে এর বিভিন্ন বিচার দেখা যায়। কেহই প্রায় বিশ্বাস করতে চায় না যে মৃত্যুর সঙ্গে দেহের সঙ্গে সঙ্গে অহং বা Ego-র শেষ। কিন্তু বর্তমান মনঃবিদ্যা বলে যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহের যেমন লয় অহংবোধ বা Ego-র তেমনি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লয়। দেহকে কেন্দ্র করে একদিন যে অহংবোধ বা Ego ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছিল—সেই দেহ যেদিন করাল কালগ্রাসে পতিত হয়ে লয়প্রাপ্ত হয় তারই সঙ্গে সঙ্গে অহংবোধ বা Ego সত্তারও সেদিনই শেষ হল। দেহ ছাড়া Ego বা অহংবোধের কোন অস্তিত্বই আজকের দিনের মনঃবিজ্ঞান বিশ্বাস করে না।

অহংবোধ দেহের পূর্বে অব্যক্ত, কিছু দিনের জন্যে দেহকে কেন্দ্র করে অহংবোধ বা Ego ব্যক্ত হয়ে উঠে আবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ অব্যক্তত্ব প্রাপ্ত হয়।

শিশু-মনে অধিশাস্তার বা সুপার ইগোর (Super Ego-এর) উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষায় ব্যক্তিত্বের গঠন বিশ্লেষণে, যথাক্রমে, যে তিনটি সত্তার পরিচয় মেলে তারা হচ্ছে অদস বা ID, অহং বা EGO ও অধিশাস্তা বা Super Ego।

জন্মকালে শিশু কোন অধিশাস্তা, বিবেক সত্তা বা Super Ego নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। জন্ম থেকে শৈশব কালের দীর্ঘদিন শিশু নীতি নিরপেক্ষ (amoral) অবস্থায় কাটায়, তখন তার মনে ন্যায় অন্যায় বোধ, ভাল মন্দ বোধ, নৈতিক অনৈতিক বোধ থাকে না।

ঈডিপাস গুঢ়ৈষা বা ইলেকট্রা গুঢ়ৈষা মিলিয়ে যাওয়ার বা সমাধানের কারণ-গুলিই, ন্যায় নীতি জ্ঞান রহিত, নীতি নিরপেক্ষ (amoral) শিশুকে, নৈতিক বোধের ও সামাজিক অনুশাসনের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়। শিশু তার অনভিপ্রেত যৌনতাকে, আগ্রাসী মনোবৃত্তিকে, তার হিংসা দ্বেষ ও অসূয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। এ ভাবেই অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে অধিশাস্তার বীজ। এ কারণেই বলা হয় ভস্মীভূত ঈডিপাস গুঢ়ৈষার ক্ষেত্র থেকেই জন্মলাভ করে অধিশাস্তা (Super Ego springs out from the ashes of oedipus complex) ধীরে ধীরে পরিবেশের প্রভাবে ও সংঘাতে শিশুর মনে বেড়ে ওঠে অধিশাস্তার পূর্ণ প্রকাশ, দেখা দেয় তার মনে ন্যায় নীতি, মূল্য বোধ, ভাল মন্দর বিচার শক্তি।

অধিশাস্তার গঠন কৌশল ও বিকাশ বিশেষ কৌতূহল উদ্দীপক। তিনটি বিভিন্ন উপাদানে তৈরী হয়ে ওঠে এই অধিশাস্তা :—

(i) পিতা মাতার প্রতিচ্ছবি বা Parental Image যা শিশুর মনে পাকাপাকি ভাবে অঙ্কিত হয়ে থাকে।

(ii) সামাজিক উত্তরাধিকার লব্ধ জ্ঞান (Social inheritance)

(iii) অহং সত্তার আদর্শ বা Ego Ideal.

(i) পিতা মাতার প্রতিচ্ছবি বা Parental Image : অতি শৈশবকালে

শিশু মাতার আজ্ঞানুসারে বা মতানুসারে কোন কাজ করলে পিতামাতা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুরস্কৃত করেন—তাকে স্নেহ, ভালবাসা প্রশংসা দেন, তারিফ করেন, অথবা তাকে খেলনা, কাপড় জামা, ছবির বই, ভাল ভাল খাবার ইত্যাদি কোন না কোন জিনিস দেন ; তেমনি আবার শিশু অবাধ্য হলে পিতামাতা তাকে তিরস্কার করেন, গালাগালি দেন, দৈহিক শাসন করেন, স্নেহ ভালবাসা বা প্রশংসা করা থেকে বিরত হন, কোন জিনিসপত্রও আদর করে তাকে আর দেন না। এর ফলে, শিশু, পিতামাতার বা তৎস্থলবর্তী বিশিষ্ট অন্য ব্যক্তিদের যা কিছু আজ্ঞা, অনুজ্ঞা, অনুশাসন, আদেশ, উপদেশ, শিক্ষা পরিচালনা ও পথ নির্দেশ প্রভৃতি সব কিছুকেই, অকপটে মেনে নেয়, ভালবাসা বা প্রশংসা বা অনুমোদন পাবার জন্য। অপর দিকে যা কিছু অন্যায়, মন্দ বা দোষণীয় বা লজ্জার তা থেকে বিরত থাকে পিতা-মাতা বা তাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের শাসন, বিরক্তি বা অননুমোদনের ভয়ে।

শিশুসন্তানের, পিতামাতাকে, এরকম সরল ভাবে মেনে নেয়ার পেছনে আছে শিশু বয়সের যুক্তি বুদ্ধি, বিচার শক্তি ও বাস্তব জ্ঞানের অভাব ও অপর দিকে পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের উপর পরম নির্ভরশীলতা, অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। এ সব কারণে শিশু ক্রমশঃ পিতামাতার নৈতিক বোধ, ভালমন্দ বিচার বিবেচনা ও যুক্তিবুদ্ধির সঙ্গে নিজের একাত্ম বোধ বা Identification-কে গড়ে ওঠতে দেয়। শিশুর মনের ভিতরে এগুলি চিরদিনের জন্য গেঁথে যায়, এমন কি পিতামাতার অবর্তমানেও তাঁদের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিমূর্তি (Parental Image), তাঁদের স্থলবর্তী হয়ে, সন্তানের মনের মধ্যে পাকাপাকি ভাবে বাসা বাঁধে। যাঁরা ছিলেন বাইরের নিয়ন্ত্রণকারী, তাঁরা হয়ে থাকেন অন্তর্যামী। রক্তমাংসের পিতামাতা হয়ত জীবিত না-ও থাকতে পারেন বা হয়ত দূরেও থাকতে পারেন, কিন্তু মনের মধ্যবর্তী এই Parental Image বা মা-বাবার প্রতিচ্ছবি চিরন্তন হয়ে সর্বদা সজাগ ভাবে সন্তানের মনের মধ্যে থেকে তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেন, আজীবন তাদের ভাল মন্দের, পাপ পুণ্যের বিচার ক্ষমতা জোগান।

(ii) সামাজিক উত্তরাধিকার (Social inheritance) লব্ধজ্ঞান :—সামাজিক উত্তরাধিকারের প্রভাব উত্তরপুরুষ থেকে পর পুরুষে বর্তায়। শিশুর

যত বয়স বাড়তে থাকে, তত পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে, প্রতিবেশীদের সঙ্গের ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সে শিক্ষা লাভ করে ও আত্মস্থ করে ধর্মাধর্ম বিশ্বাস, ন্যায় নীতি, কর্তব্যাকর্তব্য বোধ, মূল্যবোধ, সামাজিক অনুশাসন, বাদ বিচার, শিষ্টাচার, দেশাচার, লোকাচার ও স্থানীয় সংস্কৃতি। দুঃখের বিষয় যে এদের সঙ্গেই জড়িত ভাবে, অপরিণত বুদ্ধি, বিচার শক্তিহীন শিশুর মনে গেঁথে যায়, নানা প্রকারের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার।

নিশ্চিন্তে ও নির্বিচারেই শিশু এ সকলকেই আপনার বলে গ্রহণ করে এবং মনের মধ্যে পাকাপাকি ভাবে এদের স্থান দেয়। পরবর্তী জীবনে এরাই হয় তার জীবনের অনায়াস লব্ধ পথ নির্দেশক।

শিশু পরবর্তীকালে কোন অসঙ্গত কাজ বা অন্যায় কাজ করলে তার মনে দেখা দেয়, বাইরের তিরস্কার ও শাস্তির পরিবর্তে অন্তর গ্লানি, ধিক্কার, ক্ষোভ, দুঃখ, অন্যায়বোধ বা পাপবোধ।

সামাজিক উত্তরাধিকার জাতীয় ঐতিহ্যেরও বাহক এবং ধারক, এছাড়া পারস্পরিক সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্কেরও নিয়ামক।

(iii) অহং সত্তার আদর্শ বা Ego Ideal : প্রথম দিকে শিশুর জীবন আদর্শ বা Ego Ideal হয় মাতা পিতা, পরিবারের বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যেকার কোন কৃতী পুরুষ বা নারী। পরে প্রতিবেশীদের ভেতর থেকে সে বেছে বার করে কে হবে তার জীবনের আদর্শ।

ধীরে ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যত সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, কাব্য প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে, তত তার আদর্শের পরিধি বেড়ে চলে। আদর্শ হয় রাম, অর্জুন, কর্ণ, ভীষ্ম, আইনস্টাইন, মহাত্মাজী, মার্কস, মাও, রবীন্দ্রনাথ, সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, নাইটিঙ্গাল প্রভৃতি। এঁরাই হয়ে দাঁড়ায় জীবনের দিশারী। শিশু কল্পনা করতে আরম্ভ করে, জীবনের চলার পথে এঁদেরকে আদর্শ রেখে, তাঁদেরই ন্যায় জীবনে সে উচ্চ লক্ষ্যে পেঁাছাতে পারবে এবং জীবনে সার্থক হবে।

অনেক সময় অহং সত্তার আদর্শ বা Ego Ideal মনের সামনে এমনই উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে যে সে উচ্চ আদর্শে পেঁাছান, ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে

সম্ভব হয় না, ফলে তার মনে দেখা দেয় লজ্জা, হীনমন্যতা, ধিক্কার, ক্ষোভ, দুঃখ। অপর দিকে জীবনে আদর্শচ্যুতি হলে মনে দেখা দেয় অপমান বোধ. অন্যায় বোধ, শাস্তি পাবার একান্ত আশঙ্কা, এ সবের শেষ পরিণতি বিমর্ষতা, মানসিক অশান্তি বা মনোরোগ।

তিনটি উপাদানে গঠিত অধিশাস্তাকে বলা হয় অন্তরের মধ্যস্থিত চৌকিদার বা Inner Police man, অথবা অন্তরস্থিত ব্যক্তির কর্তব্য নির্ণায়ক। মনের ভিতর থেকে অধিশাস্তার বা Super Ego-র ভূমিকা হল, তিন প্রকারের (i) অধিশাস্তা হল ব্যক্তি বিশেষের বা অহং সত্তার প্রভু বা Master (ii) তার সৎপরামর্শ দাতা বা Philosopher ও (iii) তার জীবনের চালক বা পথ নির্দেশক (Guide)। অধিশাস্তাকে সন্তুষ্ট করে যে ব্যক্তি চলতে পারে, তার জীবনে দেখা দেয় শান্তি, আনন্দ, সাফল্য বোধ ও আত্মশ্লাঘা।

অধিশাস্তাকে বিবেকের চেয়েও বড় বলা হয়। অধিশাস্তার কাজ হচ্ছে অহংকে পথভ্রষ্ট হতে না দেওয়া। ব্যক্তি যে সমাজে, যে দেশে ও যে কালে জন্ম গ্রহণ করেছে ; তার ধর্ম, ন্যায়, নীতি, রীতি, মূল্যবোধ ও সংস্কারের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে, সামঞ্জস্য রেখে চলতে বাধ্য করে অধিশাস্তা। অধিশাস্তা অন্তর্যামী হয়ে অহং-এর সব কিছু কাজ কর্মের উপর খর দৃষ্টি রাখে।

উপরে অধিশাস্তার উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনায় বোঝা যায় যে অধিশাস্তা কারো জন্মগত নয়। অধিশাস্তা যদি অর্জিত হয় তবে বিবেক যা অধিশাস্তার একটি খণ্ডিত অংশ মাত্র, তাও কারো জন্মগত অধিকার নয়। অধিশাস্তা এবং বিবেক সত্তা মানুষের জীবনেরই স্বকীয় অর্জিত অভ্যস্ত ব্যবহার বা Conditioning মাত্র।

মানুষের জীবনের কর্মের প্রেরণা যদি অধিশাস্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সে হয়ে ওঠে নীতিবাগীশ, আদর্শের উপাসক যদি তার কর্মে আসে অহং বা Ego দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে সে হবে বাস্তববাদী, যদি তার কর্মের প্রেরণা অদস বা ID থেকে আসে তবে সে হবে ভাবের বেগে ভেসে যাওয়া মানুষ, প্রবৃত্তির ঝোঁকের দ্বারা চালিত বা Impulsive মানুষ।

শিশু-মনের স্বাস্থ্য—কি ক'রে রক্ষা করা যায়

প্রত্যেক ছেলেমেয়ে ও নারী-পুরুষের যেমন দেহ আছে, তেমনি তাদের মনও আছে। প্রত্যেকের দেহ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর অর্থাৎ চোখ দিয়ে আমরা দেহকে দেখতে পারি, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি, কান দিয়ে তাদের কথা শুনতে পারি, কিন্তু অপরের মন আমাদের ইন্দ্রিয়গোচরের বাইরে। মনকে আমরা জানতে পারি indirectly বা পরোক্ষ ভাবে—আচার-ব্যবহারে, কথা-বার্তায় এবং দেখে শুনে।

প্রত্যেকেরই দেহের স্বাস্থ্য রক্ষা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি মনের স্বাস্থ্যও রক্ষা করা দরকার, তা না হ'লে দেহের যেমন নানা রকমের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, মনেরও সে রকম নানা প্রকারের অসুখ হবার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকে।

মনের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় কিছু বলতে গেলেই প্রথমে কথা উঠে মনের স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি? এখানে সেই আলোচনাই করছি। মনের স্বাস্থ্যের স্বাভাবিকতার সংজ্ঞা অতিশয় জটিল, তবে মোটামুটি ভাবে, কাজ চলবার মত মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় নিচে দিলাম। যে ছেলে বা মেয়ের কথা বিবেচনা করছি—তার পিতামাতা মনের দিক থেকে সুস্থ হওয়া দরকার। কেবল যে তাদের বুদ্ধির পরিমাপ স্বাভাবিক হবে তা নয়, তাদের মনের ভারসাম্যও যথাযথ হওয়া দরকার অর্থাৎ তাদের emotion বা মনের আবেগগুলিও সাধারণ ভাবে মাত্রাতিরিক্ত হবে না। পিতা মাতার এমন কোন মনের রোগ থাকবে না যা বংশগত, যেমন মৃগীরোগ বা epilepsy, Huntington's chorea, প্রভৃতি। সিফিলিস্ বা উপদংশ রোগগ্রস্ত পিতামাতাও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে সম্পূর্ণ নিরোগ না হয়ে সন্তানের জন্ম দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ তাতে ভবিষ্যৎ বংশধর দেহ ও মনের দিক থেকে পঙ্গু হতে পারে।

প্রসবকালে যাতে শিশুর মায়ের কোন প্রকার আঘাত না লাগে, বা দীর্ঘ সময় ধরে শিশু যাতে মাতৃ গর্ভে আবদ্ধ না থাকে অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও প্রসব

সময় যাতে মাতা উপযুক্ত ধাত্রীবিদ্যাবিদের রক্ষণা-বেক্ষণে থাকে তা দেখতে হবে।

শিশু জন্মের পর আস্তে আস্তে উপযুক্ত পারিবারিক আবেষ্টনীর ভিতরে বড় হয়ে উঠবে। প্রত্যেক শিশুরই মনের উপযুক্ত প্রসারের জন্য স্নেহ ভালবাসার নিতান্ত প্রয়োজন। শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠবে, সমগ্র পারিবারিক আবেষ্টনী এমন হবে যাতে শিশু বুঝতে পারবে যে সে পরিবারের পরম স্নেহের পাত্র এবং পরম অভিপ্রেতও বটে।

দেখা গেছে যে কৃত্রিম উপায়ে সকল প্রকারের বৈজ্ঞানিক যত্ন নিলেও মাতৃস্নেহ ও মাতৃ সান্নিধ্য ছাড়া শিশু দেহ ও মনের দিক থেকে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। সে কারণে মা বা তৎস্থানীয় অন্য কোন নারীর একান্ত সান্নিধ্য ও স্নেহ যত্ন শিশুর বিকশিত হয়ে উঠবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

এ ছাড়া শিশুর দিকে একান্ত দৃষ্টি রাখার দরকার হয়, যাতে শিশু বুঝতে পারে যে সে অবহেলিত নয়—পরিবারের সকলেরই সে আদরের বস্তু।

তৃতীয়ত প্রত্যেক শিশুই চায় যে সে যা কিছু করবে তা' সবাই প্রশংসার চোখে দেখুক, সকলে তা'কে appreciate করুক। আধুনিক মনোবিদ্ সে জন্যই বলেন 'A child thrives properly by proper attention and appreciation'.

শিশু যদি সব সময়ের আলোচনার বস্তু হয়, তা'র সব কাজেই দোষ ত্রুটি ধরা হয় অথবা তা'র দোষ ত্রুটিকেই বড় ক'রে দেখা হয়, তা'হলে সেই শিশুর আত্মবিশ্বাস কখনই পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায় না—তার মনের বিকাশও অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং এ সকল শিশু কখনই বড় (খ্যাতিসম্পন্ন) হ'তে পারে না, সকল সময়ে সংশয়ের ভিতর দিয়ে জীবন যাপন করে।

মায়ের ভালবাসা, স্নেহ ও যত্ন যে শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় জীবনে সে সর্বদাই আশাবাদী (optimistic) হয়ে ওঠে। যত বিপদ-আপদই আসুক না কেন, জীবনে যত অন্ধকারই নেমে আসুক না কেন, তার আশাবাদী মনে সর্বদাই এই আশার সঞ্চার হয় যে কোন না কোন রকমে তার বিপদ কেটে যাবে—তার জীবনে পূর্ণতা দেখা দেবে। অপর দিকে যে সব শিশু মায়ের ভালবাসা ও যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেকে অবহেলিত ব'লে মনে করে তারা

পরবর্তী জীবনে সকল ক্ষেত্রে নৈরাশ্যবাদী হয়ে থাকে। সব কাজেই তারা সাফল্য সম্বন্ধে হতাশার মনোভাব পোষণ করে, মনে করে, কোন কিছুতেই তাদের মঙ্গল বা শুভ হবে না। জীবন যেন তাদের কাঁটার মালা—না আছে সেখানে ফুল না আছে তাতে সবুজ পাতা।

আজকালকার দিনে অনেক মাকেই বাইরে কাজ ক'রতে হয়, এর ফলে শিশুকে, ঝি চাকরের হাতেই প্রায় সর্বক্ষণ থাকতে হয়। পূর্বের ন্যায় এখন আর একান্নবর্তী পরিবার নাই। ফলে প্রায়শঃ শিশু আর দিদিমা, ঠাকুরমা, বা অন্য বর্ষীয়সীদের স্নেহের দ্বারা সিক্ত হয় না। ফলে শিশুর মনের মধ্যে দেখা দেয় একটা ক্ষোভ, মাকে না পাওয়ায় একটা বেদনা—এ সকল শিশু বড় হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে দেখা দেয় ভালবাসার জন্য একটা কাঙ্গালপনা। অনেক মাতৃস্নেহ বঞ্চিত এই শিশুর মনে এমনই এক অভাববোধ ও দুঃখানুভূতির সৃষ্টি হয়, যে পরবর্তী জীবনে এরা যদি নারীর প্রেম উপযুক্তভাবে না পায় তা'হলে মনের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলে এবং মানসিক রোগে ভোগে।

অনেক সময় দেখা যায় যে শিশু খাওয়া নিয়ে বড়ই অশান্তির সৃষ্টি করে। কিছুতেই খেতে চায় না বা খেলেও বমি করে দেয়। পরবর্তী জীবনে এদের মধ্যে অনেকে খাদ্যদ্রব্যের প্রতি যে একটা অনীহা দেখায় অথবা Anorexia nervosa নামক মানসিক রোগগ্রস্ত রোগী যে দিনের পর দিন কিছুই দাঁত দিয়ে কাটে না, এমন কি তরল দুধ, ঘোল বা সরবৎও খায় না বা কিছু খেলেও পরমুহূর্তে তা' বমি করে উঠিয়ে দেয়, দিন দিন এরা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'তে থাকে—অনুসন্ধান ক'রলে দেখা যাবে অতীত জীবনে অনেকেই মায়ের স্নেহ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শৈশবাবস্থায় খাদ্য ব্যবস্থা অবহেলিত হয়েছে। মা কেবল মাত্র মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত করেছেন তা' নয় অন্যান্য খাদ্যবস্তু সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন।

অনেক বিকৃত মস্তিষ্ক রোগী মনে করে খাদ্যে বিষ মেশান আছে এবং সেই জন্য কোন প্রকার খাদ্যই খেতে অস্বীকার করে—এর মূলেও দেখা যাবে, এদের শৈশবে ও অতিত জীবনে খেতে দেওয়ার ব্যাপারে মায়ের অবহেলা, অনিচ্ছা ও ঘৃণা।

মা শিশুকে উপযুক্ত পরিমাণে যত্ন, ভালবাসা ও স্নেহ দেবেন, তবে তা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে দেওয়া উচিত হবে না, অথবা তার সাধারণ শিশু সুলভ

চলতির পথে অগ্রসরের বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবেন না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিবাহিত জীবনে স্বামীর ভালবাসা পায়নি এমন অনেক মেয়ের মনে একটা বুভুক্ষা থেকে যায়, তখন তারা তাদের স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্য ভালবাসা শিশু সন্তানের কাছ থেকে আকাঙ্খা করে, যার ফলে শিশুর প্রতি একটা অতিরিক্ত ও অবাঞ্ছিত ভালবাসা দেখান। ফলে এ সকল শিশুর পরবর্তী জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি দেখা দেয়—এরা প্রায় কখনই বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারে না। মা ছাড়া আর কাউকেই এরা তেমন ক'রে ভালবাসতে পারে না।

পিতার প্রভাবও শিশুর জীবনে কম নয়। পিতার আদর্শকে তার জীবনে ছাড়িয়ে যেতে হবে, শিশু মনে মনে এরকম আকাঙ্খা করে। কাজে কাজেই পিতাকে সেই আদর্শের উপযুক্ত হতে হয়। যদি পিতা নিজেই আদর্শচ্যুত হন তবে সন্তানের কাছ থেকে খুব একটা বড় কিছু আশা করা উচিত হবে না।

সাধারণ ভাবে শিশু যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে, পিতা-মাতার কাছ থেকেই তা'রা প্রধানতঃ সেই সকল রীতিনীতি গ্রহণ করে। যে সকল হতভাগ্য শিশু শৈশবেই পিতৃহীন বা মাতৃহীন হয় অথবা উভয়কেই হারায়, তাদের পক্ষে সুস্থ মনের অধিকারী হওয়া প্রায় অসম্ভব। পিতা মাতার আশ্রয়েই শিশু বড় হয়ে উঠে। শিশু মনে মনে সর্বদাই জানে যে বাইরের পৃথিবী থেকে যত বাধা বা আঘাতই আসুক তার একটি বেশী স্নেহের আশ্রয় আছে, সেখানে গিয়ে সে সকল রকম আঘাতের হাত থেকেই রক্ষা পেতে পারবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর মনের স্বাস্থ্যের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন—নিরোগ বংশ ধারা, পিতা-মাতার যত্ন, স্নেহ ও ভালবাসা এবং দেহের স্বাস্থ্যের মত গর্ভাবস্থা থেকেই তার মনের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা। অন্য পাঁচজন ছেলেমেয়ে থেকে মনের দিক থেকে যদি শিশুর কোন অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তবে যত শীঘ্র সম্ভব মনের ডাক্তারের কাছ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন হবে।

শিশু-র মনের স্বাস্থ্য—মা ও শিশু

প্রথম জন্মের সূচনা বা conception থেকেই ভ্রূণ অবস্থায় শিশু মাতৃ-জঠরে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। নয় মাসের কিছুদিন বেশী এক রকম অঙ্গাঙ্গিভাবে ও ওতপ্রোতভাবে জরায়ুর ভিতরে ভবিষ্যৎ শিশু বেড়ে ওঠে, প্রথম দিকে তার কোন স্বাধীন সত্তার পরিচয় নাই বল্লেই চলে—তার পুষ্টি, বৃদ্ধি, তার শরীরের যা কিছু ক্লেদাদির নিষ্ক্রমণ মায়ের দেহের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

ভ্রূণ অবস্থায় শিশু যখন মাতৃগর্ভে বাড়তে থাকে, তখনকার শিশুর অবস্থাকে আমরা মনঃসমীক্ষকগণ (Psychoanalyst) passive receptive state বলি —অর্থাৎ শিশু গর্ভাবস্থায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বা inactive থেকেও তার প্রয়োজন মত সব কিছুই পায়, অধিকন্তু জরায়ুর মধ্যে সে সবরকম বাধা-বিপত্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত থেকেও রক্ষিত অবস্থায় থাকে। বাইরের পৃথিবীর উগ্র শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, বা দৃশ্য কিছুই তার ইন্দ্রিয়কে আঘাত করে না। এ ছাড়া জরায়ুর মধ্যে শিশুর চারদিক ঘিরে যে জলীয় পদার্থ liquor amni থাকে তাও শিশুকে সম্পূর্ণ ভাবে বাইরের সকল ঘাতপ্রতিঘাত থেকে রক্ষা করে। শিশু গর্ভাবস্থায় যেন স্বর্গীয় সুখেই বাস করে, না চাইতেই তার যা কিছু প্রয়োজন তা তার ভাগ্যে মিলে যায়। অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে, মানুষের যে স্বর্গের কল্পনা তারও মূলে রয়েছে এই নিষ্ক্রিয় ভ্রূণ অবস্থায় না চাইতেই সকল পাওয়ার জীবন থেকে। স্বর্গ আর কিছুই নয় গর্ভকালীন অতীত জীবনেরই কল্পিত প্রতীক।

গর্ভস্থ ভ্রূণ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠল—যখন তার দৈহিক পূর্ণতা এল তখন প্রকৃতির নির্দিষ্ট তাগিদে সে মায়ের পেট থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু তখন শিশুর মনোজীবনে দেখা দিল এক গভীর পরিবর্তন। বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী তার সমস্ত রূঢ় আঘাত হঠাৎ তার ক্ষুদ্র দেহের উপর হানল। তীব্র আলো, তা' সে দিনের আলোই হ'ক অথবা কৃত্রিম আলোই হ'ক তার চোখকে ধাঁধিয়ে দিল—কানে ভেসে

এল সমস্ত কোলাহলে ভরা পৃথিবীর শব্দ মণ্ডলী, নাকে বিজ্ঞানের সৃষ্টি, আধুনিক রাসায়নিক antiseptic-এর তীব্র গন্ধ। গাত্র পরিষ্কারের নামে চ'লল সমস্ত কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে ডলা মাজা ধোয়া। শিশুর মনের উপরের তীব্রতম আঘাত হ'ল মায়ের সঙ্গে তার শেষ দেহ ও প্রাণের যোগ তার নাড়ি (umbilical cord) কাটা হ'ল। এত দিনের শান্ত সুখের গর্ভজীবনে—মায়ের সঙ্গের একান্ত সংযুক্ত জীবনে সহসা এল ছেদ—এ যেন এতদিনকার স্বর্গীয় জীবন থেকে হঠাৎ এল অভিশপ্ত পতন—Paradise lost-এর হ'ল অভিনয়। Otto Rank প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে, শিশু জন্মকালে যে প্রথম মাতৃ-বিচ্ছেদ অনুভব করে তার পরবর্তী জীবনের সকল উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মূল এখানেই। মায়ের একান্ত সান্নিধ্য হারাবার মধ্যে যে দুঃখ-দুশ্চিন্তা তাই শিশুর মনোজীবনে প্রথম তাকে দুঃখ-ব্যথা দুশ্চিন্তার (anxities) স্বাদ বুঝিয়ে দেয়। তারপর যখনই কোন মূল্যবান বস্তু বা ধ্যান-ধারণা হারাবার অশুভ সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই তার মনে সেই জন্মকালে মায়ের সংযোগ হারাবার কালকেই যেন মনে করিয়ে দেয় আর তার মনে দেখা দেয় দুঃখ-ব্যথা-দুশ্চিন্তা-উৎকণ্ঠা (anxiety)। কিন্তু এই যে মাকে হারাবার ক্ষণিক দুঃখ, এই যে Paradise lost বা স্বর্গ থেকে বিদায়ের ব্যথা তা কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই মিলিয়ে যায়, শিশু তার মায়ের উষ্ণ কোলে স্থান পায়। মায়ের কোলে বা বুকে স্থান পাওয়া মানে হারানো স্বর্গকেই ফিরে পাওয়া, এ যেন Paradise regained। মায়ের কোলে, মায়ের বুকে, মায়ের একান্ত সান্নিধ্যের উষ্ণতা, মায়ের নিবিড় সঙ্গ ও ভালবাসা এবং তারই সঙ্গে ভেসে আসা মাতৃস্তন থেকে কবোষ্ণ অমৃত ধারা—এ যেন মাতৃদেহ থেকে ঝর্ণাধারার মত একই সঙ্গে ভেসে আসা স্নেহ ও খাদ্যের ধারা। এই জন্যই প্রত্যেক শিশুর অবচেতন মনে স্নেহ ও খাদ্য (love and food)-কে identical বা অভিন্ন বস্তু বলে মনে হয়। পরবর্তী জীবনেও দেখা যায় নর বা নারী যখন প্রেম জীবনে বঞ্চিত হয় তখন তারা তা খাদ্য দিয়ে পূরণ ক'রতে চায়, তার ফলে মনের দিক থেকে যে বঞ্চিত, ধীরে ধীরে অতিরিক্ত খাদ্যের জন্যে সে হয়ে দাঁড়ায় মেদবহুল।

যে শিশু জন্মের পর বা পরবর্তী শিশু জীবনে মায়ের একান্ত সান্নিধ্য

থেকে বঞ্চিত হয় অর্থাৎ জন্মের পরেই শিশু যদি কোন কারণে মাকে হা'রায়, সে শিশুর মন কোনদিনই স্বাভাবিক হয়ে গ'ড়ে উঠতে পারে না—তার সমস্ত জীবনে সব কাজেই দেখা যায় একটা নৈরাশ্যবাদ বা pessimism যে কোন কাজে কর্মে সর্বদাই সে মনে করে কোন কিছুতেই তার সম্পূর্ণ সাফল্য আসবে না। চেষ্টা সে ক'রে যেতে পারে কিন্তু জীবনের আরম্ভেই সে যে তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছে—তার আকাঙ্খিত মাকে পায়নি, সেই জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সে কখনও তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না, তার মনে দেখা দেয় একটা গভীর নৈরাশ্য।

যে শিশু জন্মের পর থেকেই মায়ের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয় সে শিশুর মন ও দেহ সাধারণ শিশুর মত বেড়ে উঠে না, পুষ্ট হয় না। Bowlby-র গবেষণা বা research প্রমাণ করেছে যে যত বৈজ্ঞানিক ভাবেই শিশুকে মানুষ করা হ'ক, যত যত্ন করাই হ'ক মাতৃহীন শিশুর স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় না।

যে শিশু জন্মের পরই এবং পরবর্তী জীবনে মায়ের একান্ত সান্নিধ্য সুখ পায়, মায়ের স্নেহ ভালবাসা ও যত্ন পায় সে মনোজীবনে গ'ড়ে ওঠে আশাবাদী হয়ে বা optimistic হয়ে এবং সব কাজেই সে আশা করে কৃতকার্যতা। সে ভাবে জীবনের সব লক্ষ্যেই অনায়াসে পৌঁছাতে পারবে। শরৎ সাহিত্যের সেই কথা মনে পড়ে "মায়ের দুধ খেয়েছিলি বটে আকবর" অথবা মায়ের দুলাল নেতাজী সুভাষের সেই কথা "I am an incorrigible optimist".

মায়ের নিবিড় সান্নিধ্য ও মায়ের ভালবাসা যে সকল শিশু পায় তারা হয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসী (self-confident) ও তাদের জীবন হয় প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ। আর মাকে যারা শিশুকাল থেকেই পায় না জীবনে তাদের দেখা দেয় একটা সংশয়। শিশুর জীবনে প্রথম goal বা লক্ষ্য হল মা—প্রথম লক্ষ্যে বা goal-এ যে শিশু ঠিক মত পৌঁছাতে পারল পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্যে ঠিক মত পৌঁছাবার আত্মবিশ্বাস স্বাভাবিক ভাবেই তাদের মনে গেঁথে যায়, অপর দিকে মাকে যে পেল না তার জীবনে দেখা দেয় সংশয়, দ্বিধা। সে যে পথেই এগোয়, মনে করে 'বোধ করি ভুল পথে এগিয়েছি—অন্যপথে চেষ্টা করে দেখি'। এর ফলে এদেরকে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনেক সময়ই অকৃতকার্য হ'তে হয়। মাতৃপরিত্যক্ত শিশু মনের দিক হয়ে ওঠে পঙ্গু, তার

বুভুক্ষিত চিত্ত সর্বদা খুঁজে বেড়ায় মাকে। পরবর্তী জীবনেও যদি এরা তাদের প্রেমিক দ্বারা পরিত্যক্ত হয় অথবা অবহেলা পায় তবে তাদের দেখা দেয় বিষম মনোরোগ—এরা সমস্ত পৃথিবীকেই মনে করে একটা ব্যথা-বেদনায় পূর্ণ স্নেহ-মায়া-মমতাহীন কঠোর স্থান হিসেবে। ধীরে ধীরে এরা বাস্তব থেকে স'রে যেতে থাকে এবং রোগ যখন বেড়ে যায় তখন এরা বাস্তব পৃথিবীর জায়গায় কল্পিত এক সুখ স্বর্গের সৃষ্টি করে—সেখানে তার বাস্তব জীবন যা কিছু পায়নি তা দিয়ে সে কল্পিত জগৎ বা Fantasy world-কে ভ'রে রাখে, কল্পনায় সে না পাওয়ায় দুঃখকে ভুলে। ফলে তার এই কল্পিত জীবন তাকে অবাস্তব ক'রে তোলে, মনের দিক থেকে সে হয় Schizophrenic। পৃথিবীর কোন কিছুর পরই আর সে আকর্ষণ বোধ করে না—তার emotion বা আবেগ সমূহ সম্পূর্ণ ভাবে শুকিয়ে ওঠে—সে নিরস কাঠের মত বা পাথরের মত হয়ে দাঁড়ায়। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ Jung-এর কথায় "They are lost in the magic maze of their own dream"। শিশু একটু বড় হওয়ার পর মায়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হ'লে—সে সমগ্র নারী জাতিকেই অবিশ্বাস ক'রতে আরম্ভ করে এবং তাদের সঙ্গ বা সাহচর্য সে তো আকাঙ্খা করেই না বরং ঘৃণায় তা প্রত্যাখান করে—যেমন দেখা যায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Newton-এর জীবনে। Newton-এর মা তাকে ফেলে অন্য এক প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে যায়—ফলে Newton কোন দিনই আর মেয়েদের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি এবং চিরকুমারই থেকে যান। এ সকল শিশুদের বলা হয় rejected Children বা মাতৃ পরিত্যক্ত শিশু।

আর এক রকমের শিশু এদের বলে deprived children অর্থাৎ বঞ্চিত শিশু। এরা যে মায়ের সঙ্গ একেবারেই পায় না তা নয় তবে এরা মায়ের যে পরিমাণ স্নেহ ভালবাসা আকাঙ্খা করে তা তাদের জীবনে পেয়ে ওঠা হয়ত সম্ভব হয় না। অনেক সময় এমন শিশু দেখা যায় যারা যতই মায়ের ভালবাসা পা'ক তাদের মনে হয় মায়ের কাছ থেকে যতটা পাওয়া উচিত ছিল ততটা তারা পাচ্ছে না আধুনিক দিনে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাই শিশু সন্তাকে বাড়িতে ঝি চাকরের হাতে রেখে দিয়ে, স্কুল কলেজ অথবা অফিসে যান, এসকল শিশুর মনেই এই মাতৃস্নেহ বঞ্চিত ভাবটা

বেশী ক'রে দেখা দেয়। ধীরে ধীরে এদের মনে মায়ের প্রতি একটা অভিমান বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে। এরা জীবনে হয়ে ওঠে নারীর স্নেহ ভালবাসার কাঙাল। এদের এই অতৃপ্ত ভালবাসা পূর্ণতা পায় যদি তারা পরবর্তী জীবনে সত্যকারের মমতাময়ী কোন নারীকে জীবন সঙ্গিনীরূপে পায়। দেখা যায় তারা প্রায়ই স্ত্রীকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চায়, অন্য সব কিছু কাজ কর্ম ফেলেও স্ত্রীর একান্ত সান্নিধ্যই এরা আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু যদি স্ত্রীর কাছ থেকে তাদের বঞ্চনা জোটে অথবা স্ত্রী যদি এদের তাচ্ছিল্য করে তবে এদের জীবনে নেমে আসে ভালবাসা না পাওয়ার একটা ক্ষোভ এবং এদের প্রেমের বুভুক্ষা হয়ে ওঠে অপরিমেয়। ভালবাসা পেলাম না, ভালবাসা পেলাম না এটাই তাদের সমস্ত জীবন ও মনে সারাক্ষণ ধরেই যেন গুঞ্জন তোলে।

অপরদিকে কিন্তু মায়ের অতিরিক্ত ভালবাসা পেয়ে আদরের দুলাল যারা তারা ত মনোজীবনের দিক থেকে বঞ্চিত নয়। যে সব ছেলে একান্ত ভাবেই মায়ের কাছে মানুষ হয় এবং মাকে যারা অন্য সকলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কেবল মাত্র নিজের একার ক'রে তোলে ভবিষ্যতে এদের বিবাহিত প্রেম জীবনে কিন্তু দেখা দেয় বিড়ম্বনা। এরা জীবনে কোন দিন অপর কোন নারীকে ভালবাসতে পারে না—তাদের যা কিছু স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা তা মাকে কেন্দ্র করেই আবদ্ধ হয়ে থাকে—অন্য কোন নারীকে এরা ভালবাসতে পারে না—যেমন দেখা যায় ভীষ্মের জীবনে অথবা যীশুর জীবনে—এরা নিজেদের মা ছাড়া অন্য কোন নারীকেই তাদের প্রেমাস্পদ করে তুলতে পারেনি। অপর দিকে আবার একরকমের মাতৃ আবদ্ধ পুরুষ যারা অন্য সব ফেলে খোঁজে মায়ের দ্বিতীয় সংস্করণ (Replica) কোন নারীকে—যে এসে সম্পূর্ণভাবেই তার জীবনে, মায়ের স্থান অধিকার করবে এবং সবরকমেই সে হবে তার মায়েরই মত। আরব্য উপন্যাসের বাদশার গল্প আছে—প্রত্যেক রাত্রে তিনি একটি ক'রে নারীকে বিয়ে করতেন আর দিনের বেলায় তাকে মেরে ফেলতেন—সব শেষে শাহজাদী বলে একটা মেয়েকে বিয়ে করলেন—সে রাজাকে রাতের পর রাত গল্প ব'লে যেতে লাগল —তার গল্পও শেষ হয় না আর বাদশাও তাকে মারতে পারেন না, অবশেষে বাদশা সেই নারীকে বিয়ে করলেন। মনঃসমীক্ষার চোখ দিয়ে দেখতে গেলে ব'লতে হয় ঐ বাদশা তার মায়েরই replica বা দ্বিতীয় সংস্করণকে স্ত্রী রূপে

পেতে চেয়েছিলেন তার অবচেতন মন তাকে সেদিকেই পরিচালিত করেছিল সে কারণে যে নারীকেই তিনি রাত্রে শয্যা-সঙ্গিনী করতেন দিনের আলোতে তার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে যেত। শেষ কালে যে শাহজাদীর পানিগ্রহণ করলেন—সে মা যেমন শিশুকে গল্প বলে ঘুম পাড়ায় তেমনি ভাবেই গল্পের পর গল্প ব'লে রাতে বাদশাকে সে ঘুম পাড়িয়ে যেতে লাগল—ফেলে আশা অতীত শিশু জীবনের মা'ই যেন আবার ফিরে এলেন—বাদশার অবচেতন মনের চাহিদা মিটে গেল, বাদশাও পেয়ে গেলেন তার সত্যিকারের বাঞ্ছিত জীবনসঙ্গিনীকে।

শিশুর মনোজীবনে পিতৃপ্রভাব

শিশুর সঙ্গে পিতার যে সম্পর্ক তার নির্ণায়ক হিসেবে ফ্রয়েড ঈডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus complex) নামক এক কমপ্লেক্সের অবতারণা করেন।

গ্রীসিয় উপাখ্যানে আছে যে ঈডিপাস (Oedipus) ভুলক্রমে তার বাবাকে মেরে ফেলে এবং নিজের মাকেই বিবাহ করে। পরে যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে তখন দুঃখে অনুতাপে নিজের চক্ষু দুটি উপড়ে ফেলে। ফ্রয়েড বলেন যে গ্রীসিয় নাট্যকার তার নাটকের মাধ্যমে সমস্ত মানব মনের গভীরের অর্থাৎ অবচেতন মনের এক গুপ্ত ইচ্ছাকেই ভাষা দিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরের বাসনা যে পিতাকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান অধিকার করা। শিশু বয়সে ছেলে দেখে যে পিতাই সমস্ত কিছু Power (ক্ষমতা), Position (কর্তৃত্ব; দায়িত্বপূর্ণ পদ), Prestige (সম্মান)-এর অধিকারী —শিশুর মনে দেখা দেয় হিংসা। সে চায় পিতার ক্ষমতা, সম্মান ও কর্তৃত্বের মালিকানা—দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। পিতার প্রতি সে বিদ্বেষের ভাব পোষণ করতে আরম্ভ করে অথচ তার এমন শক্তি, ক্ষমতা নাই যার বলে সে পিতাকে তাড়িয়ে দিতে পারে বা হত্যা করে তার স্থান অধিকার করে বসতে পারে। মনে মনে তার মাকে অধিকার করে নেবার যে ইচ্ছা তাও অবদমিত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

ফ্রয়েড মনে করেন যে ঈডিপাস কমপ্লেক্সের প্রভাব মানব শিশুর ও তার ভবিষ্যৎ জীবনের উপর অসীম। তার ব্যক্তিগত জীবন, তার বড় হবার ইচ্ছা, তার সমাজ জীবন, তার ধর্মীয় ভাবধারা, তার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, তার প্রেমজীবন সব কিছুর মূলেই রয়েছে এই ঈডিপাস কমপ্লেক্সের প্রভাব। এক এক করে এর বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা নীচে করা গেল।

ব্যক্তিগত জীবন : পিতৃহীন শিশু, অথবা যে শিশুর বাবা তার দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে গেছেন অর্থাৎ পিতৃ পরিত্যক্ত শিশুর মনোজীবন প্রায়শঃ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেতে পারে না—সে নিজের অধিকার সম্বন্ধেই সংশয় ভাবাপন্ন হয়ে থাকে—ফলে জীবন যুদ্ধে সে পিছিয়ে যায়। মনে মনে প্রত্যেক

মানব শিশুই পিতাকে মনে করে প্রতিদ্বন্দ্বী, তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। পিতা না থাকলে তার জীবনের মান বা standard থাকে না, সংসারের সামান্য অবস্থাতেই সে সন্তুষ্ট থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আবার এ সকল শিশু সম্পূর্ণভাবেই নিজেকে জীবন যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নেয় ফলে সে Schizophrenia নামক মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়।

পিতা অতিরিক্ত শাসনে শিশুকে রাখলে সে শিশু মনে মনে গুরুতর রকম পিতৃদ্রোহী হতে থাকে। তবে সমাজের চাপে এবং নিজের অক্ষমতার জন্য শিশু তার এই পিতৃদ্রোহী মনোভাবকে চেপে রাখে—কিন্তু পরবর্তীকালে, সমাজ জীবনে এবং তার চাকুরী জীবনে এর ফল অতিশয় বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। তার কাছে পিতৃস্থানীয় সব ব্যক্তিই হয় হিংসা, দ্বেষ ও অশ্রদ্ধার পাত্র। কর্মজীবনে সে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সর্বদাই ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত থাকে। কারণ তার অবচেতন মন কর্তা ব্যক্তিকেই পিতার সঙ্গে Identify করে বা একই স্থানে বসায়। পিতার প্রতি যে চাপা রাগ এতদিন অবদমিত অবস্থায় মনের গভীরে ছিল তাই পিতৃস্থানীয়দের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়। ফলে সমাজের কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি বা কর্মস্থলের কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কিছুতেই সামঞ্জস্য রেখে সে চলতে পারে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে এরা হয় সরকারের বিরুদ্ধাচারী। চূড়ান্ত অবস্থায় এরা হয় এনার্কিষ্ট, সন্ত্রাসবাদী বা রাজদ্রোহী। সরকার শক্তিমান এবং চালক বলেই তাকেও সে পিতার সঙ্গে একীভূত (Identify) করে দেখে। সাম্প্রতিক বহু সন্ত্রাসবাদীর আন্দোলনও মূলত পিতার বিরুদ্ধে এ সকলের অবচেতন মনের আন্দোলন। পিতৃদ্রোহিতার বহিঃপ্রকাশ রাজদ্রোহের আকার নেয়।

ধর্মীয় জীবনেও পিতার প্রভাব অপরিসীম। শিশুরা পিতাকে মনে করে সর্বশক্তিমান ও সকল বিষয়ের মালিক—কিন্তু ক্রমশঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে যখন শিশু বালক ও কৈশোর অবস্থা পেরিয়ে যায় তখন বুঝতে পারে যে পিতা সর্ব শক্তিমান নন এবং সকল বিষয়ের মালিকও নন অথচ দীর্ঘদিন পিতাকে সর্ব বিপদে আপদে সর্বশক্তিমান, রক্ষাকর্তা মনে করায় অভ্যস্ত হওয়ার ফলে পরিণত বয়সে পিতার মূর্তিকেই আরো অনেক বড় করে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে Heavenly father স্বর্গীয় পিতা বা ঈশ্বরের সৃষ্টি। যে ক্ষমতা পার্থিব পিতার নাই—তাহাই কল্পনা দ্বারা স্বর্গীয় পিতায় অর্পিত হল—দেখা দিল

মানুষের ধর্মীয় জীবনে সর্বশক্তিমান, দীন দুনিয়ার মালিক স্বর্গীয় পিতা বা ঈশ্বরের।

পিতার প্রভাবেই ছেলেরা তাদের সামাজিক পরিচয় পেয়ে থাকে তাদের জীবনের security বা স্থির নিশ্চয়তাও মেলে পিতার পরিচয়ে। তবে বৃহত্তর গাছের ছায়ায় যেমন ছোট গাছ বেড়ে উঠতে পারে না তেমনি অত্যন্ত নামী পিতার সন্তান অনেক সময় পিতৃতুল্য position বা স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয় না। যদি এদের সামাজিক প্রতিপত্তি, আর্থিক আনুকূল্য ও প্রভাব অনেক বেশী তবুও এরা পিতাকে ছাড়িয়ে উঠতে তো পারেই না জীবনে খুব বড় হওয়াও এদের কষ্টকর। বহু নামী ব্যক্তির ছেলেরাই অনামা, যদিও এর ব্যতিক্রম যে নাই তা নয়। যেমন স্যার আশুতোষের ছেলে শ্যামাপ্রসাদ বা মতিলাল নেহেরুর ছেলে পণ্ডিত জহরলাল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর পুত্রদের মধ্যে কেহই মহাত্মার ধারে কাছেও আসিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ছেলে বা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছেলেও পিতার তুলনায় অনেক নিম্নমানের। আইন-স্টাইনের ছেলে দ্বিতীয় আইনস্টাইন হয়নি। উদয়শঙ্করের ছেলের পরিচয় উদয়শঙ্কর হতে অনেক ম্লান।

শিশু বয়স হতে পিতার সান্নিধ্যের অভাব হলে সে শিশুর পরবর্তী জীবনে কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা দেয়। উদাহরণের মাধ্যমে সেটা পরিষ্কার হবে, নীচে কতকগুলি উদাহরণ দিলাম:

(১) মহাভারতের পিতামহ ভীষ্মের চরিত্র ব্যাসদেবের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। সমস্ত গুণান্বীত, পরম পণ্ডিত, অজেয় ভীষ্ম শিশুকাল থেকেই তাঁর পিতা শান্তনু থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তার মা গঙ্গার কাছে মানুষ হয়ে ওঠে। ফলে ভীষ্ম শিশুকাল থেকেই তার মার একান্ত স্নেহ ও ভালবাসার অধিকারী হয়ে থাকেন। গঙ্গার ভালবাসার ভাগীদার হিসাবে শান্তনু তাদের জীবন থেকে দূরে থাকেন। এর ফলে ভীষ্মের জীবনে দুটি প্রধান বিশিষ্টতা দেখা দেয়: (ক) রাজ্যের প্রতি তার কোন লোভ দেখা যায় না অর্থাৎ পার্থিব সম্পত্তির জন্য বা অধিকারের জন্য তিনি মোটেই লালায়িত নন। পিতা তার থেকে দূরে থাকায় তিনি তার আদর্শও নন বা প্রতিদ্বন্দ্বীও নন। সেজন্যই রাজ-অধিশ্বর শান্তনুর ছেলে ভীষ্মের পিতৃ সম্পত্তির প্রতি কোন লোভই নাই। (খ) মায়ের ভালবাসার একান্ত অধিকারী থাকায় ও দীর্ঘদিন একা মায়ের

সঙ্গে থাকার ফলে ভীষ্মের আর কোন নারীর প্রতি আকর্ষণ জন্মাতে পারে না – তিনি অকৃতদার ও চিরকুমার।

(২) যীশুও কুমারী মেরীর সন্তান—পিতৃপ্রভাবহীন ; ফলে তার কাছে অন্য কোন নারীর আকর্ষণ দেখা যায় না—তিনিও ভীষ্মের ন্যায় অকৃতদার ও চিরকুমার। ফ্রয়েডের কথায় দুজনই Mother-fixated মাতৃ-ভালবাসা আবদ্ধ ও পিতৃ প্রভাব শূন্য হওয়ার ফলেই তাদের জীবনে এ পরিবর্তন দেখা যায়।

(৩) পিতার কাছ থেকে শিশুরা সামাজিক শিক্ষা, ধর্মের শিক্ষা, জাতিগত কৃষ্টির কথা শেখে এবং পিতার কাছ থেকে এসব তারা পায় বলেই এরা এই শিক্ষিত বস্তুর কোন প্রকারের আলোচনা করে না, ভাবে না এ সকল যুক্তি বুদ্ধির দিক থেকে ঠিক কি না। যেমন হিন্দু গরু খায় না, কালীমার মূর্তি দেখে প্রণাম করে—শাস্ত্র ধর্ম অনায়াসে মেনে নেয়, কিন্তু এ সকল যে করে সেটা যুক্তিযুক্ত কি-না, অসার কুসংস্কার কি-না তা ভেবে দেখে না। তেমনি মুসলমান মূর্তি পূজা করে না, শূকরের মাংস খায় না, শব দাহ করে না, গোর দেয়—এ সকলের পেছনেও যুক্তি বুদ্ধি আছে কি না সে যাচাই করে না। বাবার বা পিতৃতুল্যের কাছ থেকে অনায়াসে না ভেবে চিন্তেই তারা এগুলি গ্রহণ করে।

কিন্তু একজনের যদি পিতা না থাকে—সেক্ষেত্রে দেখা যায় সে সমাজ সংস্কারকরূপে দেখা দেয়—সে পিতৃধর্মের সামাজিক ব্যবস্থার কাছে নতি স্বীকার না করে নতুন ধর্ম, নতুন সমাজ-ব্যবস্থা চালু করতে চেষ্টা করে। এর ফলেই দেখা যায় যে নতুন ধর্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, রাজনৈতিক বিপ্লবী বা নতুন মতবাদ প্রচারকদের মধ্যে বেশীর ভাগই পিতৃপ্রভাব বঞ্চিত। Otto Rank এ বিষয়ে তার Birth of the hero নামক পুস্তকে বিস্তৃততর আলোচনা করেন। ফ্রয়েডের লেখার নানা স্থানেও এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

মেয়েদের জীবনেও পিতার প্রভাব বড় কম নয়। অনেক মেয়েই মনে মনে চায় তার যেন পিতার ন্যায়ই কোন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়। হয় পিতার ন্যায় দেহ নয়তো পিতারই ন্যায় বিভিন্ন গুণাবলী সমন্বিত পাত্রকেই সে জীবনের সাথী ভাবে পেতে চায়। আবার পিতার অতিরিক্ত স্নেহের পাত্রী হলে সে

মেয়ের পক্ষে বিয়ে করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে চায় সর্বরকমে পিতারই সমতুল্য কোন পাত্রের গলায় বরমাল্য দিতে। অন্য কোন বরই তার মনে ওঠে না—ফলে অনেক সময়ই এ সকল মেয়ে বিবাহিত জীবনে অত্যন্ত অসুখী হয় অথবা মোটেই বিবাহ করে না। বিয়ে করলেও বাপের বাড়ীর দিকেই তার টান বেশী এবং স্বামী ঘর ছেড়ে এসব মেয়েরা বাপের ঘরে ফিরে আসতে চায়। এর ভেতরে আবার অনেক মেয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছেলের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়, সে যেন তার বাবারই দ্বিতীয় মূর্তিকে আজীবন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পিতার দ্বারা লাঞ্ছিত বা অবহেলিত হলে বা পিতার আদর না পেলে এরা পিতার এই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে চায় এবং অনেক সময়ই পুরুষকে হেয় করবার জন্য এরা পতিতার জীবনকেও বেছে নিতে পারে। এতে তিন রকম ভাবে এদের স্বার্থসিদ্ধি হয়—

(১) অসামাজিক জীবন-যাপন করার ফলে এরা পিতার সম্মানকে ধূলিসাৎ করে।

(২) এরা বহু পুরুষকে (যারা পিতার সমলিঙ্গী) সমাজের পঙ্কে নামিয়ে অপমান করে এবং পুরুষ কত সহজপ্রাপ্য তা সর্ব সমক্ষে জাহির করে।

(৩) এরা কেবল পুরুষদেরকে প্রেমপ্রার্থীরূপে তাদের দ্বারে ডেকে আনে না উপরন্তু এ সকল পুরুষের কাছ হতে উপযুক্ত অর্থও আদায় করে।

মনের দিক থেকে যারা পিছিয়ে তাদের সমস্যা

আজকে আমি মনের দিক থেকে যারা পিছিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন মানের জড় বুদ্ধিদের কথা ও তাদের সমস্যার বিষয় আলোচনা করব। এদের বিষয় আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। সেগুলি হল :—

(১) ক্রমিক-বয়স (Chronological age)

(২) মানস বয়স (Mental age)

(৩) বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence quohent)

জন্মের পর যত দিন যায় ততই যে বয়স বাড়ে তাকেই আমরা ক্রমিক বয়স বলি। সাধারণ ভাবে ক্রমিক বয়স ও মানস বয়স এর গাণিতিক মাপ সমানই থাকে, তবে জড়বুদ্ধি বা অল্পধী, ক্ষীণধী, মন্দধী, তাদের মানস বয়স ক্রমিক বয়সের অনুপাতে বাড়েনা, ক্রমিক বয়সের অনুপাতে মানস বয়স অনেক কম থাকে। মানস বয়স বিভিন্ন কতকগুলি মানসিক অভীক্ষা বা মানসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বার করা হয়।

বুদ্ধ্যঙ্ক বাহির করবার কৌশল হল :

$$\frac{\text{মানস বয়স}}{\text{ক্রমিক বয়স বা তৎকালীন বয়স}} \times ১০০ = \text{বুদ্ধ্যঙ্ক}$$

ক্রমিক বয়সের তুলনায় মানস বয়স যত কম হবে, বুদ্ধ্যঙ্কও তত কম হবে। বুদ্ধ্যঙ্ক সাধারণভাবে সকল মানুষেরই আজীবন অপরিবর্তনশীল থাকে। এই বুদ্ধ্যঙ্কর পরিমাণ অনুসারেই মানসিক ভাবে জড়বুদ্ধিদের স্তর নির্ণয় করা হয়। স্বাভাবিক বুদ্ধি যাদের তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের মাপ ১০০ ± ১০। জড় বুদ্ধিদের বুদ্ধ্যঙ্কের মাপ ০—৯০ পর্যন্ত। বুদ্ধ্যঙ্কের মাপ বা পরিমাণ যত কম থাকবে মনের দিক থেকে তারা তত পিছিয়ে থাকবে। কোন প্রকার ব্যবস্থায়, ঔষধে বা চিকিৎসায়ই সাধারণ ভাবে এই জন্মগত বুদ্ধ্যঙ্কের মাপের বা মানের

পরিবর্তন করা যায় না বা বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয় না। নিম্নে সারিবদ্ধভাবে বা ছকের আকারে বিভিন্ন স্তরে জড়বুদ্ধি ও তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের আসন্ন মান বা মাপের একটি তালিকা দেওয়া গেল :

জড় বুদ্ধির স্তর ভেদ	বুদ্ধ্যঙ্কের আসন্ন মান
জড়ধী	০—২৫
মন্দধী	২৫—৫০
ক্ষীণধী	৫০—৭০
অল্পধী	৭০—৯০

স্বাভাবিক বুদ্ধ্যঙ্কের সীমানা ১০০ ± ১০ এর মধ্যে। স্বাভাবিক অপেক্ষা উন্নত (উজ্জ্বল) বুদ্ধ্যঙ্কের সীমানা ১১০ এর বেশী থেকে ১৫০।

জড়বুদ্ধির বুদ্ধ্যঙ্কের মান যত নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে তাদের নিয়ে সমস্যার জটিলতাও তত বেড়ে যেতে থাকে। জড়বুদ্ধিদের নিয়ে যে সমস্যা সে কেবল তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, এটা একটা সামাজিক বা পারিবারিক সমস্যাও নয় এটা একটা জাতীয় সমস্যা এমন কি আন্তর্জাতিক সমস্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না। সমস্যাটি কেবল বিস্তৃত নয় এটা বেশ গভীরও বটে। যারা জড়ধী ও মন্দধী তাদের বুদ্ধি এতই কম যে এদের বেঁচে থাকতে হলেও সম্পূর্ণ ভাবে পরনির্ভরশীল জীবন যাপন করতে হয়। তাদের খাওয়া দাওয়া, কাপড় চোপড় পরান, বাইরে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করা সবই অপরকে করতে হয়। এরা 2/4 বছর বয়সের শিশুদের ন্যায়ই পরনির্ভরশীল। অনেক সময়ই এরা তাদের নিজেদের মনের কথা, এমন কি স্বাভাবিক প্রয়োজনের কথা, অর্থাৎ ক্ষুধা, প্রস্রাব, পায়খানার ইচ্ছাও বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। এদের সমস্যার সমাধান করতে হলে আত্মত্যাগী, সহানুভূতিপূর্ণ, সহৃদয় ও সুবিবেচক লোক, সমাজ সেবক, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং আন্তর্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

কেন এরকম হয় (ইটিওলজী)

জড়বুদ্ধির মূলগত কারণ বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে তিন রকমের কারণ দেখা যায় :

(1) বংশগত কারণ।

(2) পরিবেশগত বা শারীরিক অন্য কোন শিশু বয়েসের অসুখের প্রতিক্রিয়ার ফল।

(3) বংশগত ও পরিবেশগত, উভয় কারণের মিশ্রণের ফল।

বংশগত কারণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখন খুবই সীমায়িত। তবে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তাতে দেখা যায় যে কতকগুলো রকমের জড়বুদ্ধি একক জিন দ্বারা প্রভাবিত ; অন্যগুলি বহু জিন-দ্বারা প্রভাবিত, কতকগুলি ক্ষেত্রে বংশধারা আবার পথ প্রদর্শক মাত্র, পরিবেশের ব্যতিক্রমেই কেবল সেগুলি রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে।

উপরের কারণ সমূহ ছাড়া সামাজিক পরিবেশের দৈন্যও অনেকস্থলে শিশুকে মনের দিক থেকে পিছিয়ে দেয়।

(১) ভগ্ন গৃহ অথবা গৃহের অস্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ।

(২) সমস্যামূলক পিতামাতাও সন্তানের স্বাভাবিক বুদ্ধি স্ফুটনের পথে অন্তরায় হয়।

(৩) পিতামাতার শিশু পালনে অবহেলা ও গাফিলতি।

এই অবস্থার শারীরিক বিকারতত্ত্ব

শারীরিক সাধারণ পরীক্ষায়, কি যান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেক সময়ই জড় বুদ্ধিতে কোন প্রকারেরই স্থূল বা সূক্ষ্ম পরিবর্তন দেখা যায় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ স্থূল পরিবর্তনই দেখা যায়।

লক্ষণসমূহ ক্লিনিক্যাল পিকচার

(১) মানসিক লক্ষণ : জড়বুদ্ধি কতটা, সেটা নির্ভর করে এদের বুদ্ধ্যাঙ্কের উপর। যারা অতি নিম্নমানের, যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক শূন্য থেকে পঁচিশের ভেতর, তারা একেবারেই শিশুর ন্যায়, এদের খাইয়ে দিতে হয়। পায়খানা প্রস্রাব বোধ এদের নেই, হয় কোন কথাই বলতে পারে না, নয়ত দু'চারটি কথা বলে। `এদের বেড়ে ওঠার গতিবেগ অতিশয় শ্লথ অথবা স্তব্ধ। এরা সম্পূর্ণভাবেই পরনির্ভরশীল। এর পরের স্তরের জড়বুদ্ধি যারা, তারাও প্রায় উপরের স্বল্প বুদ্ধি বিশিষ্টদের ন্যায়, বুদ্ধ্যাঙ্ক ৫০ পর্যন্ত যাদের তাদের বলা যায় এরা চিরশিশু—এরা পরিবারের ভারবোঝা, সরকার ও সমাজেরও বিশিষ্ট সমস্যা। বুদ্ধ্যাঙ্ক যাদের ৫০-এর ওপর তাদের কিছু কিছু

সাধারণ কাজে লাগান যায়। এরা খাওয়া, দাওয়া, পায়খানা প্রস্রাব ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা পেলে আত্ম নির্ভরশীল হতে পারে। তবে এদের অনেকেই বিপদ আপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, এমন কি সরল কোন সমস্যারও সমাধান এরা করতে পারে না। যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক ৫০ থেকে ৯০-এর ভেতর এদের কিছু কিছু কাজ শেখান সম্ভব, তবে তাতেও বেশ ধৈর্য ও চেষ্টার প্রয়োজন।

অনেক সময় আবার জড়বুদ্ধিগ্রস্থেরা নৈতিক দিক থেকেও অতি নিম্ন মানের হয়। এরা সহজেই প্রলুব্ধ হয় এবং নানা প্রকারের অসামাজিক কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। তবে এদের ভেতরে আবার একদল জড়বুদ্ধিদের দেখতে পাওয়া যায় যাদের কতকগুলি বিষয়ের স্মরণ শক্তি প্রখর, এবং এরা অনেকেই প্রায় মোহিত অবস্থায় গান বাজনা শোনে।

মূর্খ পণ্ডিত বলে এদের মধ্যে এক দলকে চিহ্নিত করা যায়—এরা গান বাজনা অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ কৌশল ও পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম, যদিও অন্যান্য বিষয়ে এরা সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল ও অচতুর।

অনেকে যারা মনের দিক থেকে পিছিয়ে থাকে, দেখা যায় যে, তাদের যৌন সচেতনতা অল্প বয়সেই প্রগাঢ় হয়, এর ফলে সহজেই এরা বিকৃত বা অসামাজিক যৌন জীবনে লিপ্ত হয়।

(২) দৈহিক লক্ষণ সমূহ: এ সকল জড় বুদ্ধিদের বিশেষ ভাবেই স্নায়ুমণ্ডলীর বিকৃতি বা রোগ জনিত শারীরীক পঙ্গুতা দেখা যায়। এই পঙ্গুতা এমন হতে পারে যে এদের পক্ষে স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং অনেক সময়েই এদের শয্যাশায়ী অবস্থায় অথবা একই ভাবে দিন কাটাতে হয়, কেবলমাত্র অন্যের সাহায্যে এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা যেতে সক্ষম।

বিভিন্ন যে সকল কারণে শিশুরা জড়বুদ্ধির হয়, সে সকল বিভিন্ন অবস্থাও এদের দেহকে নানা প্রকারে চিহ্নিত করে যায় এবং শরীরকে অপুষ্ট, বিকৃত ও অকেজো করে দেয়।

রোগ নির্ণয়

মনের দিক থেকে যারা পিছিয়ে আছে, তাদের বেছে বার করা বা

চিহ্নিত করতে হলে নিচের পদ্ধতিতে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে, এর ভেতর বুদ্ধির অভীকাই প্রধান।

রোগ নির্ণয়ের জন্য

(১) মা, বাবা নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে এদের গর্ভকালীন অবস্থা, জন্ম সময়ে কোন অসুবিধা হয়েছিল কি-না, এরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠেছে কিনা, শৈশব অবস্থায় কোন আঘাত পেয়েছে কি-না বা কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল কি-না ; সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। সমাজ সেবক বা সেবিকারা এই ইতিহাস নেবার ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।

(২) মানসিক সমীক্ষার সাহায্যে এদের বুদ্ধির সঠিক মান নির্ণয় করতে হবে। এই সমীক্ষার কয়েকটি বিশিষ্টতা থাকার প্রয়োজন—যেমন এসকল সমীক্ষা হবে বিশ্বাস যোগ্য, নির্ভরশীল, পূর্ব পরীক্ষিত, ও নৈর্ব্যক্তিক। এ সকল সমীক্ষার কিছু হবে মুখে মুখে আর কিছু হবে হাতে কলমে।

(৩) শারীরিক পরীক্ষা—সাধারণ, যান্ত্রিক ও ল্যাবরেটারীর মাধ্যমে।

মনের দিক থেকে যারা পিছিয়ে তাদের সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিত :

সমস্যাটিকে তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়—

(১) প্রথমত যে রুগ্ন তার সমস্যা।

(২) পিতা মাতা ও পরিবারের সমস্যা।

(৩) সমাজ, সরকার ও আন্তর্জাতিক সমস্যা।

এ সকল বিভিন্ন সমস্যার আলোচনার সঙ্গে যতদূর সম্ভব তার সমাধানের ইঙ্গিতও দেওয়া গেল।

(১) যে মনের দিক থেকে পিছিয়ে আছে, তার প্রথম সমস্যা হ'ল, সে কতদূর পিছিয়ে আছে, এটা নির্ণয় করতে হলে মানসিক সমীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন এবং যত অল্প বয়সে সম্ভব শিশুটিকে কোন চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক-এ নিয়ে যাওয়া ও তাদের উপদেশ অনুসারে ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়তঃ যদি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় যে শিশুটির বুদ্ধ্যঙ্ক অতিশয় কম এবং তার স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তি কখনও ফিরে পাবার আশা নেই এবং সে চির শিশুই

দেহ ও মনের দিক দিয়ে থেকে যাবে, তবে তাকে কোন সরকারী বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে রাখার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, কারণ পিতা মাতা যে কদিন বেঁচে থাকবেন ও সক্ষম থাকবেন ততদিন তারা দেখবেন ঠিকই কিন্তু তারপর এদের কি হবে, কে দেখবে? পুরানো দিনের যৌথ পরিবার আজ আর নাই, সে কারণে এদের দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রের, বা সমাজ হিতৈষী প্রতিষ্ঠানের, তৃতীয়তঃ নিম্নমানের বুদ্ধাঙ্কের শিশুটির যদি কোন্ শারীরিক অসুখ থাকে তবে তার আশু ও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ক্রেটিন, সিফিলিস হাইড্রো-সেফালিক শিশুরা অনেক সময় তাড়াতাড়ি সুচিকিৎসা পেলে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পারে।

চতুর্থতঃ যাতে এ সকল শিশুর স্বাভাবিক ভাবে যতদূর সম্ভব মনের বিকাশ হ'তে পারে, এবং যাতে এদের সঙ্গে এদের পিতা মাতা বা ভাই-বোনদের সম্পর্ক অশোভন বা তিক্ততায় পরিণত না হয়, সেজন্য উপযুক্ত সমাজ সেবক বা সেবিকা, মনবিদ্ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মনঃচিকিৎসক চিকিৎসার মাধ্যমে, মনের দিক থেকে শিশুটিকে যেমন সাহায্য করতে পারবেন, তেমন তিনি বহুল পরিমাণে পারিবারিক সম্পর্ককেও সুন্দর ও সুষ্ঠু করে তুলতে পারবেন।

পঞ্চমতঃ যদি শিশুটির বুদ্ধ্যঙ্ক এমন হয় যে তাকে বিশেষ ট্রেনিং বা শিক্ষা দিয়ে কোন কাজে লাগান যায় তবে সে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা অবশ্যই সরকারকে করতে হবে, এ বিষয়ে ভোকেশনাল গাইডেন্স-এর ব্যবস্থাও সরকার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে নিতে হবে।

ষষ্ঠতঃ এ সকল নিম্ন বুদ্ধ্যঙ্কের শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়তে দিলে স্বাভাবিক ভাবেই এরা অবহেলিত হ'বে এবং বারংবার অকৃতকার্য হওয়ার ফলে সহাধ্যায়ীদের টিট্কারীর পাত্র হয়ে দাঁড়াবে, তার ফলে এরা আরো গুটিয়ে যাবে। এ অবস্থার হাত থেকে রেহাই পেতে হ'লে এদের জন্য আলাদা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে—যেখানকার স্কুলের আবহাওয়া হবে এদের ভাল হয়ে ওঠার সহায়ক। শিক্ষকগণ হবেন বিশেষ ভাবে ট্রেনিং প্রাপ্ত, সহৃদয়, সহানুভূতিশীল ও মানবিকতাপূর্ণ মনের অধিকারী। চেষ্টা হবে তার বুদ্ধি ও যোগ্যতাকে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া।

সপ্তমতঃ ভবিষ্যতের দিকে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে যদি নতুনতর গবেষণালব্ধ ফল এদের কোন উপকারে আসে। এই গবেষণা বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন—চিকিৎসা, শিক্ষা, সমাজ চেতনা, সব দিক জুড়েই এটা হওয়া দরকার। অনেকে আশা করেন যে জৈবিক এন্‌জিনিয়ারীং দ্বারা এ সকল রোগ বংশগত যে কারণে হয় সেই বংশধারাবাহক জীন বা ক্রোমোজোমকে আকাঙ্ক্ষিত ভাবে পরিবাহিত করে, ভবিষ্যৎ শিশুকে সমস্ত রকম অশুভ সম্ভাবনার হাত থেকে রেহাই দেওয়া যায়। কিন্তু খোরানা প্রভৃতির গবেষণার তথ্য থেকে বলা যায় যে, এ সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনও অন্ধকারে হাতড়ান অবস্থায় আছে; মানুষের জীন বা ক্রোমোজোমের আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন করার সম্ভাবনা এখনও কল্পনার মধ্যেই সীমায়িত। এ ছাড়া যদি কখনও এরকম একটি বা বহু জীনকে আকাঙ্ক্ষিত ভাবে পরিবর্তিতও করা যায়, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে যে আরো অনেক অনভিপ্রেত পরিবর্তন ও শিশুর দেহ ও মনে যে দেখা দেবে না তার নিশ্চয়তা কি?

(২) পিতা মাতা ও পরিবারের সমস্যা

প্রথমতঃ যে যুবক যুবতী বিবাহিত হতে যাচ্ছে তাদের ভালভাবে দেহ মনের পরীক্ষা নিরীক্ষা—যাতে স্বাভাবিকভাবে তারা সুস্থ দেহ ও মনের সন্তানের সৃষ্টি করতে পারে, এ জন্য এদের প্রি-ম্যারিট্যাল কাউনসেলিং-র সাহায্য নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ এদের নিম্ন বুদ্ধ্যঙ্কের সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তবে এদের উচিত হবে যত সত্বর সম্ভব, উপযুক্ত চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক-এ শিশুকে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানকার সমাজ সেবক/সেবিকা, মনোবিদ্ ও মনঃচিকিৎসকের ও সাধারণ দেহ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া। যদি শিশুটি মনের দিক থেকে অতি নিম্ন মানের হয় তবে, তার এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে শিশুটিকে কোন রাষ্ট্রীয়, বা দাতব্য বা সমাজ সেবী দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে দেবার ব্যবস্থা করা, যেখানে সে উপযুক্ত ভাবে লালিত পালিত হবে।

তৃতীয়তঃ পিতা মাতা যেন কোন কারণেই, এ সকল শিশুরা মনের দিক থেকে পিছিয়ে আছে বলে, এদের অবহেলা, ঘৃণা বা লাঞ্ছনা না করেন।

অনেক সময় অনেক পিতা মাতা সর্বসাধারণের ভেতর এদের নিজেদের সন্তান বলে স্বীকার করে নিতেও রাজী হয় না। পিতা মাতা ও ভাই বোনদের সঙ্গে যাতে এ সকল অসহায় রোগীদের সম্পর্ক মধুরতর হয় সে জন্য সর্বদাই সমাজ সেবক/সেবিকা ও মনঃচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ যে সকল ক্ষেত্রে দম্পতির নিজেদের পিতৃ বা মাতৃকুলে বা নিজেদের বুদ্ধির স্বল্পতা আছে, সে ক্ষেত্রে সে সকল দম্পতির যাতে কোন সন্তান না হয়, সে বিষয়ে সজাগ হওয়া প্রয়োজন এবং সবচেয়ে ভাল হয় যৌন জীবন আরম্ভ করার পূর্বে বন্ধ্যকরণ করে নিলে।

পঞ্চমতঃ যদি কোন দম্পতির একটি শিশু জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, তবে ভবিষ্যতে তাদের যাতে আর কোন সন্তান না হয় সে ব্যবস্থা করা, দরকার মত বন্ধ্যকরণ অপরেশনের সাহায্য নেওয়া।

(৩) সমাজ, রাষ্ট্র (সরকার) ও আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সমাধান

প্রথমতঃ যেহেতু কোন পরিবারের পক্ষেই এই জটিল এবং গভীর সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, সে কারণে সমাজ, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমুদয়কেই এগিয়ে আসতে হবে, যাতে তারা অবহেলিত, সমাজ জীবনে চিহ্নিত হয়ে অকালে প্রাণ না হারায়।

দ্বিতীয়তঃ সর্ব দিক থেকে জড়বুদ্ধিদের সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা এবং এক দেশে এ রোগ সম্বন্ধে যে নতুন জ্ঞান লাভ হয় বা গবেষণালব্ধ ফল পাওয়া যায় তাকে বিভিন্ন Mass Media গণপ্রচার মাধ্যমে যেমন পত্র পত্রিকা, রেডিও, টি. ভি. প্রচার বক্তৃতার মাধ্যমে সর্ব দেশে ছড়িয়ে দেওয়া। দরকার মত জ্ঞানের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা। আলোচনা চক্র, বিশেষজ্ঞের Exchange-এর ব্যবস্থা।

তৃতীয়তঃ প্রচারের মাধ্যমে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে, সকল লোকই জড়বুদ্ধিদের সমস্যার বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠে।

চতুর্থতঃ গবেষণা প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, অর্থ সাহায্য করা, উপযুক্ত লোক বেছে বার করা, দরকার মত লোককে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রেনিং দিয়ে তাদের দেশে ফিরে পাঠান।

পঞ্চমতঃ এ সকল জড়বুদ্ধিদের থাকবার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান করা, এবং বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়া।

ষষ্ঠতঃ জড়বুদ্ধি সম্পন্ন রোগীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান করা। এর ভেতর অনেকগুলিই দাতব্য প্রতিষ্ঠান হলে ভাল।

সপ্তমতঃ জড়বুদ্ধিদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন ও তৎজন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করা।

তরুণ তরুণীর মন

তরুণের মন আনে চিরন্তন বিস্ময়, তরুণীর মন নিয়ে আসে অনন্ত জিজ্ঞাসা। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানুষের মন নিয়ে প্রকৃতি যে খেলা খেলে, মনোবিদের চোখ দিয়ে আজ তারই আলোচনা করব।

নয় দশ বছরের বালক বালিকা আপন মনে থাকে, মা বাবা গুরুজনদের কথা মত চলে, পরম বাধ্য, শান্ত, অল্পেই সন্তুষ্ট। কিন্তু এরই পরে ১১-১২ বছর বয়স থেকে হঠাৎ শরীরে দেখা দেয় অদ্ভুত পরিবর্তন। অন্তঃস্রাবী রস বা হরমোনগুলির নিষ্কাষণে আসে এক পরিবর্তন যা শরীরে এবং মনের ওপর এনে দেয় ঝড়ের বেগ, দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার ডাক, আগতিক জীবনের জন্য প্রশস্তি। দেহে দেখা দেয় গৌণ যৌন পরিবর্তন (Secondary Sexual Change)। ছেলেদের হয় স্বরভঙ্গ, দেহের বিভিন্ন স্থানে দেখা দেয় যৌবনোচিত পরিবর্তন, মুখে গজায় গোঁফ, দাড়ি, শরীরের বিভিন্ন স্থানকে আবৃত করে ফেলে রোম রাজি। মেয়েদের দেহেও বয়সোচিত পরিবর্তন দেখা দেয়। দেহ সুডোল হয়ে ওঠে—দেখা দেয় মাসিক রজঃস্রাব। দেহে হঠাৎ এ পরিবর্তনের ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ছেলে মেয়ের দৃষ্টি পড়ে নিজের দেহের দিকে। চলে আবার নতুন করে নিজের দেহকেই আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা। প্রকৃতি কেবল দেহের পরিবর্তন করেই ক্ষান্ত হয় না—মনের ভেতরে আনে সে বহুগ্রাসী পরিবর্তন।

(১) **দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে মন-যৌন জীবন বা Psycho sexual life-এর পরিবর্তন :** মেয়েদের জীবনে দেখা যায় যৌবনে যখন তারা ঋতুমতী হন—ঋতুস্রাবকালে তাদের মনে দেখা দেয় তরুণদের প্রতি একটা অনীহা—তারা তখন এড়িয়ে চলে তরুণদের সঙ্গ। কিন্তু যখন এর ১০ থেকে ১৪ দিন পরে তাদের ডিম্ব স্ফোটন বা ovulation হয় তখন কিন্তু তাদের মনে আসে ঠিক বিপরীত পরিবর্তন, তখন তারা আগ্রহ ভরে আকাঙ্ক্ষা করে পুরুষের, বিশেষ তরুণের সঙ্গ।

পুরুষের বেলায়ও ঠিক এ রকমের না হলেও যখনই তাদের শুক্রস্থলী বা

Seminal Vesicles বীর্যরসে পূর্ণ হয় তখনই তারা আকৃষ্ট হয় নারীর প্রতি, আকাঙ্ক্ষা করে তাদের নিবিড় সঙ্গ।

(২) **কৈশোর যৌবন সন্ধিক্ষণের দিবা স্বপ্ন (Day Dream) :**— স্বাভাবিক প্রত্যেক কিশোর কিশোরী, প্রত্যেক তরুণ তরুণী দেখতে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনের রঙীন স্বপ্ন। এই স্বপ্ন ছায়াছবির মত তাদের মানস চক্ষে খেলা করে বেড়ায়। এই ছায়াছবির তারাই দর্শক, তারাই Hero বা Heroine বা নায়ক নায়িকা। স্বপ্নের জাল বুনে তারা চলে—কখনও নিজের ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে মনের এই খেলা। কখনও বা নিজেকে সে দাঁড় করিয়ে দেয় রাজনীতির পটভূমিকায়, নেতার ভূমিকায় এবং উন্নতির সিঁড়ি ধরে সে ধাপে ধাপে উঠতে থাকে সাফল্যের শীর্ষস্থানে পরম সম্মানের উচ্চ মঞ্চে, আবার কখন হয়ত সে নিজের কর্মজীবনের সাফল্যেরই ছবি গেঁথে চলে, নিজেকে সে দেখে কর্মজীবনে পরম কৃতকার্য নারী বা পুরুষ হিসাবে। কখন এই কল্পনার খেলা চলে নিজেদের শিক্ষা জীবনের কৃতিত্বের ও সাফল্যের উজ্জ্বলতায়। যে পর্যন্ত না রূঢ় বাস্তব তাদের এই কল্পনা বিলাসকে ভেঙ্গে দেয়—সে পর্যন্ত নিভৃত নিরালায় বসে রূঢ় বাস্তবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সে তার নিজেরই তৈরী কল্পনার মায়াজালের ভেতরে নিজেকে বেঁধে রেখে পরম তৃপ্তি ও আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকে—বাস্তব সময়, কর্তব্য, স্থান সবই যেন ম্যাজিকের মত অন্তর্হিত হয়ে তাকে নিয়ে যায় পরম পরিতৃপ্তির স্বপ্নলোকে।

সব তরুণ তরুণীই দিবা স্বপ্ন দেখে—কিন্তু বাস্তবকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে যে তরুণ সম্পূর্ণভাবেই এই দিবা স্বপ্নে আপনার মন প্রাণ সঁপে দেয়—তার পক্ষে শেষ পর্যন্ত মনের ভারসাম্য (Mental Balance) রক্ষা করে চলা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সে ভবিষ্যতে হিস্টিরিয়া বা Schizophrenia—সিজো ফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার খুব আশঙ্কা থাকে।

(৩) **তরুণ তরুণীর নিজেকে স্বাধীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মনোবাসনা :** প্রত্যেক তরুণ তরুণী তার পেছনে ফেলা জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখে যে সে এতদিন পর্যন্ত মা বাবার নির্দেশেই তার জীবন চালিয়ে এসেছে। নিজের স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্বকে কখনই সে আমল দেয় নাই বা দিতে পারে নাই। আজ কিন্তু তরুণ জীবনের নতুন পাওয়া বিচার শক্তি

দিয়ে সে সব কিছুকেই বিচার করে দেখতে চায়। কোন জিনিসকেই সে আর সহজভাবে গ্রহণ করতে নারাজ। চালাতে চায় পরীক্ষা নিরীক্ষা সর্বস্তরে। জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় সে স্বাধীনভাবে। তার চলার পথকে সে নিয়ন্ত্রিত করতে চায় যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে—সেখান থেকে সে ভাব-প্রবণতাকে অথবা Sentimentality-কে বিদায় করে দিতে চায়। এরই ফলে তরুণ মনে দেখা দেয় বিদ্রোহ—সে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চায় যে পৃথিবীর এতদিনকার যে রাজনৈতিক, সামাজিক জঞ্জাল, অসন্তোষ, অশান্তি অবিচার এর মূলে রয়েছে পূর্ব পুরুষের অযৌক্তিক পথ নির্দেশ, ও ভুল ন্যায় নীতির বিচার। সে চায় এ সকল অন্যায়কে ভেঙ্গে চুরে নতুন, সুন্দর পৃথিবী গড়তে। তাদের এই যৌবনের বিদ্রোহের কথাই ভাষা পায় রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ" বা নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতায়। একে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় "Generation gap"-এর বহিপ্রকাশ। মনঃসমীক্ষা বলে oedipus complex :

এত যে তড়পানি, এত যে বড় বড় কথা, তবুও কিন্তু তরুণ তার মনের গভীরে জানে সে বড় অসহায়, কারণ পিতা মাতাকে বাদ দিলে তাদের মুখের বুলি ছাড়া সহায় সম্পদ তো কিছুই নাই। তার তো সে হিসেবে "Have nots"-দের দলে। অভিজ্ঞতাও তাদের কিছুই নাই—তাদের পথ চলার পাথেয় কি হবে—অভিজ্ঞতাহীন, যুক্তি, বুদ্ধিতে তাদের জীবন পথে কেবল পায়ে ঠোকরেরই সৃষ্টি করবে। জীবনে তারা যা কিছু ভেঙ্গে চলতে পারে —কিন্তু বাস্তব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এ সকল তরুণ গড়বে কি করে– নতুন গড়তে হলে যে রসদ লাগে যে ক্ষমতার দরকার হয় তাও তো সম্পূর্ণভাবে উপরের পুরুষ বা Upper generation-এর হাতে। অনেক তরুণ তরুণী আবার চলার পথের অলঙ্ঘনীয় বাধার সম্মুখীন হয়ে মনের দুঃখে ধর্ম, কবিতা বা আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চায়। কেউ বা সমাজ সংস্কারক কেউ বা সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হয়।

(৪) **তরুণ তরুণীর অসহায় অবস্থা ঃ** সমাজ জীবনে তরুণ তরুণীর মতামতকে যারা বয়স্ক তারা বিশেষ আমলে আনেন না। কখনও তাদের কথাবার্তা বা ব্যবহারকে তারা "ন্যাকামি" বলে উড়িয়ে দেন, আবার কখনও তাদের কথাবার্তায় বয়স্কদের ভাবধারা দেখলে "পাকামি" বলে তিরস্কারের

চক্ষে তাকান। এই "ন্যাকামি" আর "পাকামি"র ভেতরে একটি অসহায় দোলকের মত দুলতে থাকে অসহায় তরুণ তরুণী।

(৫) তরুণ তরুণীর স্ফুটনোন্মুখ ব্যক্তিত্ব সত্তা ঃ তরুণ তরুণীরা স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের আকস্মিক দৈহিক পরিবর্তনের সহিত নিজেদের বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠে—তারা বেশে বাসে, ব্যবহারে, কথাবার্তায় নিজেদের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। নিজেকে নানাভাবে সে দেখতে চায় যে সে সকলের থেকে এক আলাদা মানুষ এবং নিজে নিজের আত্ম-প্রকাশে ব্যস্ত। এই আত্মসজাগ ভাবের জন্যই তরুণ-তরুণী স্বাভাবিক ভাবেই স্পর্শ কাতর এবং অল্পেই অভিমান করে বসে, সামান্য কারণেই তার মনে হয় তাকে বুঝি অগ্রাহ্য করা হল, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হল। তার আপনার ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্যই সে চায় কোন বিশেষ অর্থকরী কাজে নিজেকে লিপ্ত করতে, মনের ভেতরে গ্লানি বোধ করে অকৃতকার্যতায়।

প্রেম তার চক্ষে এ সময়ে নীলাঞ্জন পরিয়ে দেয়—আধেক বাস্তব আর আধেক কল্পনা দিয়ে সে পেতে চায় প্রেমাস্পদকে।

পূর্ণবয়স্ক বা প্রাপ্ত বয়স্কের মনো জীবন

কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণের পর ধীর পদক্ষেপে, প্রত্যেক তরুণ তরুণী এগিয়ে যায় প্রাপ্ত বয়স্কের জীবনে। জীবনের প্রাথমিক স্তরগুলি অর্থাৎ শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর, বয়ঃসন্ধিক্ষণছায়া ফেলে প্রাপ্ত বয়স্কের মন জীবনের পূর্ণতা ও অপূর্ণতার ক্ষেত্রে, স্থির হয়ে যায় তার জীবনের ধ্যান ধারণা, তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও আদর্শ এবং জীবন দর্শন (Weltan Schauung)। কল্পনায় দেখা দেয় তার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা ও রূপরেখা। ক্রমে তার ব্যক্তিত্বের হয় পূর্ণ বিকাশ, চরিত্র পায় তার সম্পূর্ণ রূপ। শরীর ও মনে দেখা দেয় পক্কতা বা Maturity। লেখা পড়া, পেশাগত ও অন্যান্য সর্ব-রকমের শিক্ষা-নবিশীর সমাপ্তির পর, প্রাপ্ত বয়স্ক প্রবেশ করে গার্হস্থ্যাশ্রমে। জীবিকা অর্জন, ও ঘর বাঁধার প্রস্তুতি ও প্রশস্তি। হিন্দু শাস্ত্রে বলে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ঈপ্সিত ফলের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমেই তিনটির পূর্ণতা আশা করা যায়। যে কারণে মহাভারত ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্রের বইতে গার্হস্থ্যাশ্রমকেই সর্ব শ্রেষ্ঠ আশ্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গার্হস্থ্যাশ্রমে হতে হয় আত্মনির্ভরশীল, নিতে হয় রাষ্ট্র, সমাজ ও নাগরিক জীবনের সমষ্টিগত যা কিছু দায় দায়িত্ব, ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় জীবন সংগ্রামে। ব্যষ্টির সীমায়িত গণ্ডী ছেড়ে তাকে লিপ্ত হতে হয় সমষ্টির বৃহৎ কর্মকাণ্ডে। আজ সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে, নিজের মত ও পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়েছে। আত্মনির্ভরশীলতায় সে আজ অভিভাবকের নির্দেশ, শাসন ও সদা জাগ্রত দৃষ্টি থেকে মুক্ত, আজ সে নিজের বিচার বিবেচনা দিয়েই জীবনের যা কিছু সমস্যা তার সমাধানের চেষ্টা করবে।

(১) **পূর্ণ বয়স্ক বা প্রাপ্ত বয়স্কের প্রথম পদক্ষেপ জীবিকা অর্জন :** আগের দিনের সামন্ততান্ত্রিক (Feudal Society) সমাজ ছিল সমবায় বা সহযোগিতামূলক (Co-operative), সকলেই বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গেই কোন নির্দিষ্ট কাজে বহাল হত। বড় হলে যে যার কৌলিক পেশা অথবা পিতৃ-পিতামহের কাজ পেত। পারিবারিক পরিবেশই ছিল তার মূল শিক্ষাক্ষেত্র

—কেউ হত কামার, কেউ হত কুমোর, কেউ হত স্যাক্‌রা, কেউ বা পূজারী, পণ্ডিত বা জমিদার। সে সমাজব্যবস্থায় ছিল সকলে মিলে মিশে যে যার কাজ করবে, একে অন্যের পেশা নেবে না। এল ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। তার সঙ্গে এল প্রতিযোগিতামূলক (Competitive) ভাবে জীবিকা গ্রহণের ব্যবস্থা, সৃষ্টি হল এক দল নতুন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির। এরা স্কুল কলেজে পড়ে, দীর্ঘদিন শিক্ষানবিশ হয়ে থাকল—কিন্তু এই নতুন প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থায় কাজের উপযুক্ত হলেই, অর্থাৎ মেধা, বিদ্যা ও অন্যান্য সংগুণ থাকলেই কাজ পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ লোকের সংখ্যানুপাতে কাজের সংখ্যা কম ও সীমিত, তা ছাড়া কাজ পেতে হলে চাই প্রভাব প্রতিপত্তি, এছাড়া আছে আত্মীয়স্বজন-পোষণ নীতি, অপকৌশল, ঘুষ দেওয়া নেওয়া ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ফলে অনেকেই জীবন যুদ্ধে অন্যায় ভাবে হেরে যায়, দেখা দেয় অভিশপ্ত বেকার জীবন। আবার মজার ব্যাপার এই যে হয়ত মেধা, শিক্ষা ও অন্য সকল গুণে গুণী হয়েও অন্যায় সমাজ ব্যবস্থায়, মুরুব্বীর অভাবে, ধরা করার লোকের অভাবে সে হয়ত কাজ পেল না। মনে তার কত দুঃখ ব্যথা, গ্লানি কিন্তু কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত, এর উপর দেখা দিল, আত্মীয় বন্ধুদের ঠাট্টা তামাসা অপমান। সব দিক বিবেচনা না করেই সবাই তাকে চিহ্নিত করল অপদার্থ, অকর্মন্য বলে। ধীরে ধীরে তার নিজের মনেও সংশয়, হীনমন্যতা দেখা দেয়, আত্মবিশ্বাস কমে আসে, নিজেকে সে সত্যই মূল্যহীন ও অপদার্থ বলে ভাবতে আরম্ভ করে। অনেক সময় সব দিক দিয়েই অন্ধকার নেমে আসে, সব রকমের সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, দেখা দেয় হতাশা ও নিরাশ ভাব। তখনই দেখা দেয় বিকৃত চিন্তা ভাবনা—আত্মহত্যা, অথবা যে সমাজব্যবস্থা তাদের অবস্থার জন্য দায়ী তার বিরুদ্ধে উদ্ধত বিদ্রোহ। তারা ভাবে অথবা সোচ্চার হয়ে বলে এ সমাজ আমরা ভেঙ্গে দেবো, আমরা সুখী হবো না, উপর তলার অন্যদেরও অন্যায়ভাবে সুখী হতে দেব না, এরা হয় সমাজদ্রোহী. ওয়াগণ ব্রেকার (Wagon breaker), মাস্তান, স্মাগলার বা চালানদার, চোর, ডাকাত বা ছিনতাইকারী, লম্পট বা নেশাখোর, এরা নামে হিংসাত্মক রাজনীতির কুটিল পথে। অথবা রূঢ় ও তিক্ত বাস্তবের আঘাত সহ্য করতে না পেরে হয় মানসিক রোগের শিকার। অপর দিকে অন্যায় ভাবে যে

কাজ পেল সেও সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না—সর্বদাই তার মনে দেখা দেয় সন্দেহ, অপরাধবোধ, ও হীনমন্যতা, এছাড়া আজকের দিনে কর্মস্থলেও আছে দলাদলি, বিভিন্ন Union-এর অভিশাপ।

কর্মপ্রার্থীদের জন্য উপযুক্ত জীবিকা নির্ণয় বা Job Selectionও কম দুরূহ নয়। আজকের দিনের যে কোন পাশ করা ছেলে বা মেয়ের কাছেই কাজ বাছাইও একটা সমস্যা। তার নিজের ইচ্ছা হয়ত যে কাজে বেশী পয়সা প্রতিপত্তি ও প্রভাব সে কাজ নেওয়া বা তার অহেতুক ও অসম্ভব স্বপ্ন দেখা। অভিভাবক বা পিতার ইচ্ছা তাঁরই পেশায় ছেলে ও মেয়েকে যোগদান করান, ছেলে মেয়ের সে কাজে যোগ্যতা বা ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক। কিন্তু সকল দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হ'ল পেশা বা জীবিকা, মনঃ-বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্ণয় করা। মনোবিজ্ঞানীরা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি কোন্ কাজের উপযুক্ত তা নির্ণয় করার জন্য, দুটি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করেন। প্রথমতঃ হল কর্ম বিশ্লেষণ বা Job analysis—নির্দিষ্ট কাজটিতে যে যে মৌল একান্ত প্রয়োজনীয় গুণের দরকার তার বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়তঃ, কর্মপ্রার্থীর কোন বিশেষ কাজের উপযুক্ততা নির্ণয় করতে হলে নীচের এ সকল বিষয়েই বিশেষভাবে জানতে হয়:

(১) তার বুদ্ধির পরিমাণ বা বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligent Quotient)।
(২) তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় ও পরিমাপ।
(৩) তার বিভিন্ন ভাবাবেগের (Emotional) ভারসাম্যতা।
(৪) তার নিজের কোন কর্মের বিষয় আগ্রহ বা কৌতূহল।
(৫) তার অতীতের কর্মদক্ষতা, কর্মকুশলতা, কর্মকৃতিত্ব, অভিজ্ঞতা।
(৬) তার মেধা ও শিক্ষার মান ও অতীতের শিক্ষানবীসতা (Training)।
(৭) তার চরিত্র ও স্বভাব, সে অন্তর্বৃত্ত (Introvert) না বহির্বৃত্ত (Extrovert)।
(৮) পারিবারিক পটভূমি, পরিচয় ও পরিবেশ।
(৯) খেলাধূলা ও অন্যান্য Extracurricular activity বা পড়াশুনা ছাড়া অন্যান্য দিকের দক্ষতা।
(১০) কর্ম বিষয়ে তার নিজের পছন্দ, অপছন্দ।

(১১) সামাজিক সম্পর্ক অথবা পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ (Healthy inter-personal relationship) কি-না ?

(১২) সে দেহ ও মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক কি না ?

আদর্শগতভাবে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে কর্মের উপযুক্ততা নির্ণয় করা সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে খুব অল্প ক্ষেত্রেই এ ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়।

কোন কাজ পাওয়ার পরেই প্রশ্ন ওঠে কি করে কাজটিতে ধাপে ধাপে উন্নতি হতে পারে এবং কাজে সফলতা আসতে পারে এবং নিজের মনে কাজের বিষয়ে সন্তুষ্টি আসতে পারে, ইংরেজীতে যাকে বলে Job Success এবং Job Satisfaction, কাজের উন্নতি যদি খাঁটিভাবে নির্ণীত হয়, তবে তা নির্ভর করা উচিত—

(১) কর্মকুশলতা বা কর্মদক্ষতা,

(২) মেধা, বুদ্ধি, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান,

(৩) সংযম,

(৪) কর্মে শৃঙ্খলা,

(৫) নিয়মানুবর্তিতার উপর।

কিন্তু আজকের দিনে কাজের উন্নতি নির্ভর করে—খোসামোদ, মোসাহেবী বা চাটুকারিতা, পারিবারিক প্রভাব, অর্থবল ও অন্যান্য প্রকারের প্রভাব প্রতিপত্তি, মুরুব্বী, রাজনৈতিক বিশিষ্ট দল বা পার্টির সদস্য থাকা, অথবা কোন বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় সভা ও সম্প্রদায়ের সভ্য বা সদস্য হওয়া, অপকৌশল, দল পাকানোর ক্ষমতা প্রভৃতি অসাধু ও অশুভ উপায় সকলের উপর। একটা চলিত কথার খুবই প্রচলন আছে যে কোন পেশায় অর্থাৎ ডাক্তারী বা ওকালতীতে উন্নতির সোপান হচ্ছে—Patrimony (পিতৃকুলের প্রভাব), Matrimony (শ্বশুরকুলের প্রভাব), College Money (অর্থাৎ Medical College বা Law College-এর সঙ্গে সংযোগের ফলে অর্থাগম ও উন্নতি)।

তারপরের প্রশ্নই হল কাজের স্থিরতা ও নিশ্চয়তা। কোন প্রকারের কাজ হয়ত মিলল—কিন্তু নানা অজুহাতে দুই দিনের ভেতরই সে কাজ চলে গেল। বিশেষভাবে কলকারখানার কাজে, সওদাগরী অফিসের কাজে

অথবা একক মালিকের কাজের স্থিরতা, নিশ্চয়তা বা Security-র বড় অভাব। সরকারী চাকুরী বা শিক্ষা বিভাগের চাকুরী, ব্যাঙ্কের চাকুরী ইত্যাদিতে Job Security বা কাজের স্থিরতা নিশ্চয়তা বহুল পরিমাণে বর্তমান। কাজের নিশ্চয়তা না থাকলে মনের ভেতরেও সর্বদা একটা উদ্বিগ্নতা, উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা দেখা যায়। তাছাড়া কোন কিছু পারিবারিক কাজ—যেমন বিবাহ, ঘরবাড়ি করা ইত্যাদিও বা plan মতো হতে পারে না। এছাড়া চাকুরী থেকে ছাঁটাই হলে একদিকে যেমন ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা অপরদিকে তেমন অপর লোকেদের কাছ থেকে সহানুভূতির নামে অপমান। উপযুক্ত জায়গায় ও উপযুক্ত চাকরী না পেলে সে হয়, গোল পেরেকের চৌক গর্তে প্রবেশ করানোর মত অসম্ভব চেষ্টা। কর্মে সফলতা ও সন্তুষ্টি আসে যদি উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত জায়গায় বসান যায়। অন্যথা কর্মস্থলে দেখা দেয় অশান্তি, অকর্মন্যতা। মনোবিদেরা দেখেছেন অনুপযুক্ত লোককে কর্মে নিয়োগ করার ফলে দেখা দেয় :

(১) অনুপস্থিতি বা absentism—কারণ কাজ ভাল লাগে না, সে জন্যই নানা অজুহাতে, কর্মী কাজে অনুপস্থিত হয়।

(২) অনুপযুক্ততা—চেষ্টা সত্ত্বেও কর্মী কিছুতেই ভাল কাজ করে উঠতে পারে না, কাজে প্রায়ই ভুলচুক দেখা দেয়, আশানুরূপ কাজ এগোয় না।

(৩) অসুস্থতা—অনেক সময়ই কর্মীর অপরাগতা থেকে মনের ভিতরে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা, অপরাধবোধ, মানসিক হতাশা এবং এ সকলের ফলেই ধীরে ধীরে সে মানসিক অসুখের শিকার হয়ে পড়ে।

(৪) আসক্তি—মনের অশান্তি ও নিজের হীনমন্যতাকে অন্তত সাময়িক-ভাবে ভুলে যাওয়ার জন্য এরা নানা প্রকারের নেশাসক্ত হয়ে পড়ে।

(৫) আকস্মিক বিপদ—(accident)—কাজ এরা না জানার ফলেই অনেক সময় অপকাজ করে বসে, আকস্মিক বিপদ বা accident ডেকে আনে, বিশেষভাবে যারা কলকারখানায় আধুনিক ও জটিল যন্ত্রাদি নিয়ে কাজ করে।

আজকের দিনে যে সকল পূর্ণ বয়স্ক বা adult কোন কাজই পেল না, বেকার জীবন যাপন করছে, সরকারী হিসাবে সারা ভারতে তাদের মোট

সংখ্যা ২ কোটির ওপর, এছাড়া অর্ধ বেকার যে কত আছে তার ইয়ত্তা নাই, এ অবস্থা যে কোন দেশের পক্ষেই ভয়াবহ। বেকার যারা, তারা দীর্ঘ দিনের হতাশার ফলে হয় আত্মঘাতী, নয় মনঃ রোগী অথবা সমাজদ্রোহী আর সমস্ত সমাজের পক্ষে এরা ছাইয়ে চাপা আগ্নেয়গিরি বা Volcano, যে কোন সময় এরা অগ্নি উদ্গিরণ করে সমাজকে ভস্মীভূত করে ফেলবে।

মানুষের বিয়ের প্রয়োজন কি ?

(অ) মনের মিলন, (আ) দেহের মিলন, (ই) মিলিত গার্হস্থ্য জীবন—সন্তান সৃষ্টি ও সন্তান পালন (ঈ) মিলিত সমাজ জীবন, (উ) মিলিত ধর্মজীবন :

(অ) মনের মিলন : হিন্দুদের বিয়ের মন্ত্র বলে :

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদেতৎ হৃদয়ং মম
যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।"

অথবা "মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু।"

এখানে পরস্পরে হৃদয় বিনিময় অথবা একের হৃদয় ও মনকে অপরের হৃদয় ও মনের অনুগামী হবার প্রার্থনা। ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের বাইবেলেও আছে।

'The Two Shall be one flesh'

এ সবের ভেতর দিয়ে মানুষের অন্তরের চিরন্তন কামনাই ভাষা পেয়েছে।

আধুনিক দিনের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে আমরণ নিবিড়তম জীবন সঙ্গী, জীবন সঙ্গিনীর, এদের ভেতর চলবে অন্তরের সব কিছুর অবাধ দেওয়া নেওয়া। পরস্পরের কাছে থাকবে না মনের কোন কিছুই ঢাকা বা গোপন। একদিকে হয়ত থাকবে অফুরন্ত দাবী ও অধিকার বোধ, অপর দিকে থাকবে কর্তব্যের শৃঙ্খল। দুজনের মনের সম্পর্ক হবে সম অনুভূতির, মমতার, পরস্পরকে মেনে নেবার উদারতা, পরস্পরকে হাসি মুখে ক্ষমা করা, জীবনের দীর্ঘ চলার পথে দেখা দেবে না অমিল ছন্দ। সব কিছুকে ঢেকে থাকবে প্রেমের স্বচ্ছ আবরণ। মনের দিক থেকে দু জনের বুদ্ধ্যঙ্ক

(Intelligent Quotient), অনুভূতি ও উপলব্ধি হবে তুল্যমানের যাতে মনের ধ্যান ধারণা, ভাবের আদান প্রদান হয়ে ওঠে সহজ ও সরল।

(আ) দৈহিক মিলন বা দেহের মিলন : হিন্দু রতিশাস্ত্রকারগণ স্ত্রী পুরুষের দৈহিক মিলনের সঙ্গতির দিকে চেয়ে, তারা স্ত্রী পুরুষকে নানা প্রকার ভাবে ভাগ করেছেন তার একটি হচ্ছে, নারী দেহগত ভাবে তিন শ্রেণীর মৃগী, ঘোটকী, করিণী বা হস্তিনী, এরা পুরুষ দেহগত শ্রেণী শশক, বৃষ ও অশ্বের সহিত সর্বভাবে দৈহিক মিলনের উপযুক্ত। আজকের দিনের Sexologist-রা এরূপ ভাগে বিশ্বাস করেন না, তারা মনে করেন সব উপযুক্ত ও পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রীই সব বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে মিলন সুখ অনুভবে সক্ষম।

বিবাহিত নর-নারীর দৈহিক মিলন কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, কি জৈবিক বা নৈতিক ধর্ম সবদিককারই অনুমোদিত বিধান। বাঞ্ছিত মিলন মুহূর্তে, ধীরে ধীরে বাইরের পৃথিবী যেন কোথায় মিলিয়ে যায়, অন্তরের সব কিছু কামনা বাসনা ও চিন্তা ভাবনার হয় অবসান, নিজেদের দ্বৈতসত্ত্বা ও আমিত্বের হয় বিলোপ, সব কিছুকে ডুবিয়ে দেখা দেয় এক আনন্দ-ঘন অনুভূতির আবেশ। হিন্দু শাস্ত্র বলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরম মিলনের এ এক ক্ষুদ্র অনুকরণ মাত্র। এই মিলনের ফলেই সন্তান সৃষ্টি, যার ভেতর দিয়ে নিজেদের (স্বামী স্ত্রীর) যা কিছু অস্ফুটিত ভবিষ্যৎ শুভ সম্ভাবনা, তারা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবে। চলবে মহাজাতির প্রগতির ধারা। ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ মরণশীল কিন্তু সন্তান সন্ততি ও বংশধারার মধ্য দিয়ে সে অমর।

মানসিক ও শারীরিক অপরিপক্কতা ও অপটুতা নর নারীর বিবাহিত জীবনের সুখ শান্তির অন্তরায়। যৌন বিকৃতি, যৌন অসঙ্গতি, কামশীতলতা, অসংযত ও অসামাজিক যৌন জীবন, যৌন জীবনে অবিশ্বস্ততা, দাম্পত্য জীবনে এনে দেয় আবিলতা অস্বাচ্ছন্দ্য ও অনিশ্চয়তা।

(ই) (i) মিলিত গার্হস্থ্য জীবন—(ii) সন্তান সৃষ্টি ও সন্তান পালন :

গার্হস্থ্য জীবনের প্রথম পদক্ষেপই হল বিয়ে করে গৃহিণীকে আনা—হিন্দু শাস্ত্রকাররা বলেন "গৃহিণীং গৃহমুচ্যতে"। দুজনে মিলে, তারপর, গার্হস্থ্য জীবনের দায় দায়িত্ব নেওয়া, সন্তান যারা এলো তাদের মানুষ করে তোলা।

কালিদাসের কথায় বিবাহিত স্ত্রী গার্হস্থ্যাশ্রমে হলেন গৃহিণী, সখী, সচিব ও কলাবধূ। অল্প বয়সে বিয়ে হলে দুজনের মনই থাকে পেলব মাটির মত নরম, তাকে পরস্পরের প্রয়োজন মত অদল বদল করে নিয়ে মিলিত জীবনের মনের মিলনকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু দু'জন যদি ফেলে আসা কুমার কুমারী জীবনের দীর্ঘদিন, দুটি সামন্তরাল রেখার ন্যায় বেড়ে ওঠে, দু'জনের মনের ভেতরই দেখা দেয় কতগুলো বদ্ধমূল ধারণা, কতগুলো বিশেষ মানসিক প্রবণতা যদি দানা বেঁধে ওঠে, তবে বিয়ের পর দুজনার মনের দিক থেকে একাত্মবোধের অন্তরায় হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। মিলিত জীবনে সফলতা আনতে হলে, চালাতে হবে তাদের যুগ্ম কর্মপ্রচেষ্টা। জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে হলে তাদের প্রয়োজন হবে দ্বৈত চেষ্টা।

গার্হস্থ্য জীবনে কন্যা খোঁজে বরের কর্মের যোগ্যতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, শিক্ষার মান, আর্থিক সঙ্গতি, সামাজিক সম্মান ও চরিত্রবল, বর খোঁজে কন্যার রূপ, সতীত্ব, সামাজিক মান, মানসিক উচ্ছলতা। এখন আর একান্নবর্তী পরিবার বড় একটা নাই, এখনকার পারিবারিক ব্যবস্থা হল দম্পতি-কেন্দ্রিক (Conjugal family বা Nuclear family)। এর ফলে চাকুরে বউয়ের কদর খুব বেশী। কিন্তু বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ সন্তান হওয়ার আগে এবং যখন সন্তানরা বড় হয়ে পূর্ণ বয়স্ক হয়ে নিজেদের পায়ে না দাঁড়ায় তখনকার সময়, স্বামী স্ত্রী দু'জনেই চাকুরে হলে কোন অসুবিধা হয় না, তখন দু'জনে মিলে মিশে ঘরকন্নার ও গৃহের দৈনন্দিন কাজ সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারে এবং দশটা পাঁচটা অফিসও দুজনেই করতে পারে। কিন্তু মেয়েরা অফিস করলেও সর্ব সময়েই তাদের মন পড়ে থাকে বাড়ীর দিকে, মনের অন্তঃস্থলে চলতে থাকে স্বামী, পুত্র, কন্যার চিন্তা। আরো একটি অসুবিধা আছে—বিবাহ মানেই স্বামী স্ত্রীর দেহ ও মনের ঘনিষ্ঠতম ও দীর্ঘতম সম্পর্কের অঙ্গীকার, কিন্তু আজকের দিনের চাকুরে স্বামী ও স্ত্রী, যে যার কর্মস্থলে, কর্মসঙ্গী বা কর্মসঙ্গিনীর সঙ্গেই জীবনের দীর্ঘতম সময় কাটাচ্ছে। এর ফলে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক সীমিত হচ্ছে একত্রে খাওয়া ও শোয়ায়। এতে দাম্পত্য জীবনে দেখা দিতে পারে অসূয়া এবং অবিশ্বাস। যার ফলে শেষে হয়ত ঘরই ভেঙ্গে যেতে পারে।

আগেকার দিনের ধারণা ছিল কি দেহে, কি মনে পাত্র পাত্রী থেকে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর হবে অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে স্বামীই হবেন প্রভু এবং চালক। আজকের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নতর, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যই সে পথ দেখায়। স্ত্রী দেবীও নয়, দাসীও নয়, সে সম সুখ-দুঃখ-ভাগী, সর্ব বিষয়ের নির্ভরস্থল, এবং জীবন সঙ্গিনী ও সত্যিকারের অর্ধাঙ্গিনী। স্বামীর পাশে পাশে সমানে সমানে সে চলবে। হিন্দুর বিয়ের প্রতিজ্ঞায় যে বলা হয়, সুখে দুঃখে ব্যসনে ভোগে তোমাকে আমি ছাড়িয়ে যাব না অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ

"রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাবো

... ...

... ...

... ...

মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—

তুমি আছ আমি আছি।"

আদর্শগত ভাবে আধুনিক দিনের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এই হল পরিচয়। পরম নির্ভরশীলতা ও পরস্পরের আত্মসমর্পণের জীবন এই গার্হস্থ্যাশ্রম। সন্তান সৃষ্টি ও সন্তান পালনঃ বুৎপত্তিগত অর্থে সন্তানকে নিজেরই বিস্তার বা প্রসার বুঝায়, মানুষ মরণশীল সে সন্তান প্রজননের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। যাদের বিবাহিত জীবনে সন্তান এলনা, পেলনা জীবনের আশীর্বাদ, প্রকৃতির দান, তাদের জীবনে দেখা দেয় একটা শূন্যতা, একটা অভাব। বৃদ্ধ বয়সের অক্ষম, নির্ভরশীল দিনগুলির কথা ভেবে এদের একটা অসহায় বোধ দেখা দেয়।

সন্তান বাঞ্ছনীয় হলও, বর্তমানে অনেকে নানা কারণে মোটেই সন্তান চায় না, মনে করেন এ এক অতিরিক্ত ঝামেলা। অনেকে আবার রাষ্ট্রীয় নির্দেশে দু'টি মাত্র সন্তানই কামনা করেন। অনেকে আবার অদূরদর্শীর ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবেই ভাগ্যের ওপর নিজেদের ছেড়ে দেন এবং অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যক সন্তানের সৃষ্টি করেন। ভারতবর্ষে সাধারণ ভাবে শিক্ষিতদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিশেষ ভাবে চালু দেখা যায়, তবে একটা কথা বৈজ্ঞানিক ভাবে এখনও আমরা জানি না, যে সকল সন্তানের মধ্যে কোন্ সন্তানটি

সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, মহাত্মাজী, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি সকলেই মা বাবার শেষ দিককার সন্তান। এদের মা বাবা যদি আধুনিক দম্পতির ন্যায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতেন, তবে ভারতবর্ষ কি বাস্তবিকই সংস্কৃতির দিক থেকে অনেক নেমে যেত না।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ, যদি কেবল মাত্র সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে যদি সুপ্রজননের (Eugenics) দিকেও দৃষ্টি দিত, তবেই কেবল পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবার কল্যাণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে হত। দেশ, অনভিপ্রেত ও অকর্মণ্য স্বভাবের লোকের তুলনায় গুণী জ্ঞানীর সংখ্যায় ভরে যেত। জন্ম নিয়ন্ত্রণে, জৈবিক প্রেরণা বা ক্ষুধার সঙ্গে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার দ্বন্দ্বের ফলে, অনেক সময়ই মনের ভারসাম্য রক্ষা করা কষ্টকর হয়। ফলে মানসিক রোগ দেখা দেওয়াও অসম্ভব নয়।

একটি দম্পতির জীবনে যখন একটি সন্তান আসে, তখন নবজাতকের লালন-পালনের জন্য মা বাবাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে শিশু স্বার্থের দেখা দেয় অসঙ্গতি, মা বাবা ফিরে যেতে চায়, সন্তান জন্ম পূর্বে অবাধ দাম্পত্য জীবনের ধারায়, সন্তান পালন যেন তাদের অবাধ গতির জীবনের পক্ষে কাঁটা ও বাধা। ছেলেরা মেয়েরা তখন হয়ে দাঁড়ায় অনাহুত ও অনধিকারীর পর্যায়। দেখা দেয় ভালবাসার দ্বন্দ্ব, আগে যে ভালবাসা স্বামী স্ত্রীর নিজেদের মধ্যেই সীমায়িত ছিল, তারই অনেক অংশকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় নবজাতকের দিকে। নবাগতর জন্য যে অর্থ ও সময় দিতে হয় তাকেও তারা ভার বোঝা মনে করে এবং যেন বাধ্য হয়েই সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেই তা করে যায়। অন্যদিকে আবার অনেক বাবা মা শিশুদের অতিরিক্ত আদর দিয়ে "আদুরে গোপালে" পরিণত করে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এরা অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় আবার ছেলে-মেয়েদের সামনে অসম্ভব আদর্শকে তুলে ধরা হয়, যে লক্ষ্যে তারা কখনই পৌঁছাতে পারবে না, যা তাদের সাধ্যাতীত। এর ফলে শিশুদের মনে দেখা দেয় অকারণেই হীনমন্যতা ও মানসিক অনুপযুক্ততা (Inferiority and Inadequacy)। যে মা বাবা নিজেদের দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়, তাদের সন্তান-সন্ততিও প্রায়শঃ বিবাহিত জীবনে সুখী হয় না। অনেক সময় আবার এ সকল মা বাবা নিজেদের দাম্পত্য জীবনের অপূর্ণ সুখ ও ভালবাসার পূর্ণতা

চায় সন্তানের মাধ্যমে ; বিশেষ ভাবে মা চেষ্টা করে ছেলের ভালবাসা পেতে এবং বাবা চেষ্টা করে মেয়ের ভালবাসা আদায় করতে। কিন্তু সন্তান কখনই স্বামী বা স্ত্রীর স্থান অধিকার করতে পারে না। এর ফলে সন্তানের মনে অসুস্থ, অস্বাভাবিক এবং অশুভ পরিণতি দেখা দেয়। তারা মাতৃ-আবদ্ধ (Mother-fixated) বা পিতৃ-আবদ্ধ (Father-fixated) সন্তানে পরিণত হয় এবং ভবিষ্যতে বিবাহিত জীবনে এরা কখনও সুখী হতে পারে না। অথচ সন্তানদের জীবনে ভালভাবে সংসারী করা, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাওয়ার দায়-দায়িত্ব মা-বাবার।

সন্তান যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন তারা অনেক বিষয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়, নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে চায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা মা বাবার আশ্রয় ছেড়ে নিজেরাই হয়ত পৃথকভাবে থাকবার বন্দোবস্ত করে। এতে বৃদ্ধ মা বাবার মনে একটা শূন্য শূন্য ভাব দেখা দেয়, নিজেদের অনেকটা অসহায়ও মনে হয়।

বিয়ের ভবিষ্যৎ : বিয়ের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে দেখা দিচ্ছে যথেষ্ট আশঙ্কা ও সংশয়। আগের দিনে কি হিন্দু, কি ক্যাথলিক খৃষ্টান এদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে বিয়েটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান (sacrament), ভগবানের নির্দেশেই বিয়ে, এবং কেবলমাত্র ভগবানই দম্পতির মধ্যে একজনকে ডেকে নিয়ে সে বিয়ের অবসান ঘটাতে পারেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে, নতুন আইনে বিয়েটা দাঁড়িয়ে গেছে একটা আইনানুগ রাষ্ট্রীয় চুক্তিতে (legal contract)। আধুনিক দিনের ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য আদর্শগতভাবে বিয়ের মান ও বিয়ের ভবিষ্যৎ স্থায়ীত্ব অনেক কমে গেছে। অপর দিকে অনেক শিক্ষিত মেয়েরা স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে বিয়ের দায়িত্বকে অস্বীকার করতে চায়। তারা ভুলে যায় যে বিয়ের প্রয়োজন কেবলমাত্র অর্থিক সমস্যার সমাধানে নয়, এর প্রয়োজন মানসিক, শারীরিক, পারিবারিক ও সামাজিক। বহু প্রয়োজনের মধ্যে অর্থ নৈতিক প্রয়োজন একটিমাত্র। আজকের দিনের মিশ্র সমাজ ব্যবস্থার ফলে, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা স্বাভাবিক। এর ফলে বিবাহিত দম্পতির মনে দেখা দেয় অসূয়া, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস, এগুলিও বিবাহিত জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহজ বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা। বিয়ের

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুলেছে, জন্মনিয়ন্ত্রণের বিবিধ সহজ ব্যবস্থা, ফলে অনভিপ্রেত অবৈধ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আশঙ্কা নেই। এছাড়া যৌন রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার সহজ ও সুলভ ব্যবস্থা, এর সঙ্গে মিলেছে উঠ্‌তি বয়সের ছেলেমেয়েদের স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্মক্ষেত্রে, উৎসবে, ব্যসনে অবাধ মেলামেশার সুবিধা ও ব্যবস্থা। এর ফলে বিয়ের স্বীকৃতির বাইরেও অবাধ দায়িত্বশূন্য যৌন মিলন সম্ভব হচ্ছে। তবে এ সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে সন্তানের জন্য, ঘর বাঁধার জন্য প্রত্যেক নরনারীর মধ্যেই একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। বিয়ে ও ঘর বাঁধার বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত প্লেটোর, সোভিয়েত রাশিয়াও তার প্রাথমিক দিকের সব কিছু পুরানোকে ভেঙে ফেলার অতি উৎসাহে, বিয়ের ও পাকাপাকি বন্ধনকে অস্বীকার করেছিল, বৈষ্ণব, বৈষ্ণবীরা, বৈরাগী ও সহজিয়া সম্প্রদায়ও বিয়েকে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু কোনটাই সফল হয় নাই। মানব সমাজে বিয়ের প্রথা সেই আদিম কাল থেকে আজও সমানে চলছে। মানুষের মনের ভেতরই বোধ হয় বিয়ে এবং ঘর বাঁধার একটা প্রয়োজন ও প্রবণতা পাকাপাকিভাবেই আছে। অবিবাহিত নরনারী সমাজের চক্ষে সন্দেহের ও উৎকণ্ঠার কারণ।

(৩) চলমান জগৎ ও সমাজের সঙ্গে সমন্বয়: পূর্ণবয়স্ক নর বা নারী তার নিজের চারিদিকে একটা একক আদর্শের বেড়াজাল সৃষ্টি না করে নিজেকে সমাজ ও চলমান জগতের সঙ্গে একটা সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করবে। যাতে ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির অমিল ছন্দ না হয় সে বিষয়ে সর্বদা যত্নবান হবে। শৈশবের পরনির্ভরশীলতা, কৈশোরের অবাস্তব দিবাস্বপ্ন, তারুণ্যের উদ্ধত বিদ্রোহ ও সব কিছু পুরাতনকে ভেঙে চুরে নষ্ট করার কল্পনা আজ আর নাই। আজ সে পরমত সহিষ্ণু, যুক্তি বুদ্ধি দিয়েই সে এগোতে চায়, আত্মকেন্দ্রিক ভাবাবেগে ভেসে যেতে সে নারাজ। প্রাক্ পূর্ণবয়স্কের বছরগুলো তার কেটেছে পরীক্ষা নিরীক্ষায় এবং তা থেকেই সে তার নির্দিষ্ট পথের সন্ধান পেয়েছে। সে সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার, দেশাচারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সামনের দিকে এগিয়ে চলতে চায়, চলমান জগতের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে। নতুন নতুন সমাজানুগ কাজে সে হাত দেয়, তার সফলতা তার মনে এঁকে দেয় কৃতকার্যতার স্বীকৃতি ও আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ

কর্মে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা ও উৎসাহ।

(৪) ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ : এই সময়ে নর বা নারীর মনের বিভিন্ন গুণাগুণ দানা বাঁধে, কতকগুলো ধ্যান-ধারণা হয় বদ্ধমূল। সে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করে জীবনে সে কি চায়, জীবনে তার পরিচয়ই বা কি হবে? কি চাওয়া তার উচিত বা সঙ্গত। চিন্তা ভাবনা তার হয়ে ওঠে বাস্তবানুগ। সে নিজের মত ও পথ সম্বন্ধে হয় সজাগ। আজ তার চরিত্র সুগঠিত, স্বভাবের ভেতরের তারুণ্যের চাঞ্চল্য কমে এসেছে, বাইরের আগ্রহ, কৌতূহল বা উৎসাহ অনেক কমে এসেছে, ক্রমশঃই মনটা গৃহমুখী হচ্ছে—যার ফলে রেডিও, T. V. পত্র-পত্রিকার দিকে যাচ্ছে তার মন। সে আজ সৎ অসৎ-এর বিভেদ নিজেই ভাল করেই বোঝে। পরিবারের একজন হিসাবে, অথবা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তার যা কিছু কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব তা মেনে চলে। সকল প্রকারের সামাজিক যোগাযোগ বজায় রাখে, বিভিন্ন পর্যায়ের সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যথাযথ সামঞ্জস্য রেখে চলে। জীবনে যা কিছু শুভ সম্ভাবনা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলবার চেষ্টা করে। জীবনের চলার পথে দুঃখ, ব্যথা, অসফলতা, ব্যর্থতা, অপমানের গ্লানিতে ভেঙে পড়ে না। সব দিক থেকেই একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, বিচার, শাসন ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পৌর ব্যবস্থা, সব বিষয়েই নিজের সুচিন্তিত মত পোষণ করে। কিন্তু অনেকেরই আবার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ বা মনোজীবনের স্বাভাবিক পূর্ণতা বয়সের সঙ্গেই দেখা দেয় না। বাইরে পূর্ণ বয়স্ক হয়েও এরা মনোজীবনে শৈশব, কৈশোরের সীমানা পেরিয়ে যেতে পারে না। এরা সমাজ ও পরিবারের ভার বোঝা।

(৫) জীবন দর্শন (Philosophy of life or Weltanschauung) ও আত্মজীবন আদর্শ (Ego ideal) : এদের কাছে প্রশ্ন দেখা দেয় তার জীবনের লক্ষ্য কি? আদর্শ কি? প্রশ্ন জাগে সে কার মত হতে চায়—শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, মার্কস্, মাও, সুভাষ অথবা আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, হিটলার, নেপোলিয়ান। তেমনি আবার ধর্মের দিক থেকে সে কি বিশ্বাস করে, সে কি নাস্তিক, আস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী না সুবিধাবাদী, বিপদে, আপদে, কামনায়ই কেবলমাত্র ভগবৎ বিশ্বাসী, সে তার সমস্ত জীবনকে কোন

বিশিষ্ট দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায়। তার ন্যায়নীতি, কর্তব্যাকর্তব্য, কিভাবে নির্দিষ্ট হবে। সে অবাধে যুক্তি বুদ্ধি ও নিজের বিচার বিবেচনা দিয়ে তার বাপ, পিতামহের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পথ ও মতকে ছেড়ে নতুন পথের পথিক হওয়ার অধিকারী হ'তে পারবে কি?

বার্ধক্যের মানুষের,—জীবন সন্ধ্যার মানুষের, মন

ষাটের উপরের বয়স, জীবনের সন্ধ্যা, জীবনের পড়ন্ত অবস্থা, এর ছায়া ফেলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে

(১) দেহ	শারীরিক ক্ষয় জৈবিক শক্তির সর্বাঙ্গীন হ্রস্বতা বার্ধক্যজনিত রোগ।
(২) মনে	স্মরণ শক্তির ক্রমিক হ্রস্বতা, সীমায়িত নতুন অভিজ্ঞতা— অতীতের স্মৃতিচারণ ও রোমন্থন, বুদ্ধি, মেঘাবৃত সূর্যের ন্যায়, দীপ্তিহীন, স্পর্শ কাতরতা, মৃত্যু ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ও সংশয়।
(৩) সমাজ জীবন ও পারিবারিক জীবন	প্রজন্মের ফাঁক ও ফারাকের সমস্যা (generation gap) যে ছিল এতদিন সমাজ বা পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্থলের সম্মানিত ব্যক্তি, সে আজ সমাজ ও পারিবারিক জীবনের মূলস্রোত থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত।

(ক) কর্মজীবন—অবসর, সব কিছু নতুন সৃষ্টির অবসান।

(ক) ক্ষয় ও পড়ন্ত অবস্থা (Decline) :

"Last Scene of all,
That ends this strange
eventful history,
Is second childishness

and mere oblivion,
Sans teeth, sans eye, sans
taste, sans everything."
Shakespeare—As you like it,
Act II, Sc, VII.

জীবনের পড়ন্ত বেলায়, বয়স যত বেড়ে চলে, চোখ, কান, নাক, জিভ ইত্যাদি সকল ইন্দ্রিয়েরই ক্ষমতার হয় ক্রমিক হ্রস্বতা। দেহের সৌন্দর্য নষ্ট হতে থাকে, চুল পড়ে যায়, পেকে যায়, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়ে, ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে, দাঁত পড়ে যায়, চোখে ছানি পড়ে। শরীরের শক্তি ও কর্ম-ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। হজমশক্তি কমে যায়, হৃদযন্ত্র, ধমনী, মস্তিষ্ক প্রভৃতিও আর পূর্বের ন্যায় সক্ষম থাকে না। ঠিকমত ঘুম হয় না, ফলে মনের শক্তিও বহুলাংশে নষ্ট হয়। শরীরের সকল যন্ত্রাদিই ক্রমশঃ দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়, তারই ফলে মনের ভেতরে দেখা দেয় অবসাদ। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা, দ্রুত হাঁটা, শারীরিক অন্য সব কাজেও তখন অক্ষমতা বা কষ্ট। সর্বশরীরে দেখা দেয় অপারগতা, দুর্বলতা, অকর্মণ্যতা ও ক্ষয়। এ ছাড়া সর্বদাই ভয় থাকে বিভিন্ন প্রকারের বার্ধক্যের রোগের, যেমন হৃদরোগ, কর্কটরোগ (Cancer), রক্তচাপ (Blood pressure), স্মরণ-শক্তির হ্রস্বতা, নিদ্রাহীনতা, মূত্রাশয়ের মুখাশয়ী গ্রন্থি বা প্রস্টেটের বৃদ্ধি।

প্রতিক্রিয়া কাল বেড়ে যায় (Delayed reaction time), বাইরের সব কিছুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সকলই তাদের গভীরতা (intensity) হারায়।

শরীরের এ সকল ক্ষয়ক্ষতি, ক্ষমতার এই সীমায়িত অবস্থা স্বাভাবিক-ভাবেই মনের উপর প্রতিফলিত হয়, দেখা দেয় বিমর্ষতা, অবসাদ আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্থবিরতা। নিজের নড়াচড়ার অক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশ ও সামাজিক পরিধিও সঙ্কুচিত ও সীমায়িত হয়ে আসে।

মনের দিক থেকে স্মরণশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে, দূর অতীতের কথায় যতটা বিস্মৃতি দেখা দেয়, তার চেয়ে নিকট দিনের স্মৃতি-ভ্রংশতা দেখা দেয় বেশী; পরম পরিচিতের নাম পর্যন্ত কিছুতে স্মরণে আসে না, রাস্তাঘাটও ভুল হয়ে যায়, সবই মনে হয় যেন অপরিচিত। বৃদ্ধাঙ্কের

(Intelligent Quotient) পরিমাণও ধীরে ধীরে অনেক সময় নেমে যেতে দেখা যায়। মনের সজাগ ভাবও (alertness) অনেক কমে আসে, মনটা যেন কেমন ভোঁতা হয়ে আসে। মনের সৃজনশীলতাও বহুল পরিমাণে কমে আসে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে, যে সকল কাজে পারদর্শিতা দেখা দেয়, সেই সেই কাজ অনেকটা রুটীন (routine) মাফিক করে যাওয়া সম্ভবপর হয়, কিন্তু নতুন কোন কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় না। কাজ থেকে অবসর নিলে তখন সমস্যা দেখা দেয় শূন্য ও কর্মহীন সময়কে কি করে ভরে দেওয়া যায়। হিন্দুরা যে বৃদ্ধ বয়সে পূজা-আচ্ছা নিয়ে থাকতেন বা দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়নে মন দিতেন তাতে তাঁদের কর্মহীন সময় ভরে থাকত। যাঁদের জীবন বহুমুখী ও যাঁদের বহু বিষয়ে উৎসাহ বা interest, তাঁরা কখনও কর্মহীন সময়ের চাপে কষ্ট পান না।

মনের আবেগ চেপে রাখার ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে, অনেক সময় অকারণে ও অল্প কারণেই এঁরা ভাবাবেগে ভেসে যান। অল্পেই অসন্তোষ, বিরক্তি ও চোখের জল দেখা যায়। সব সময়ই নিজের অক্ষমতার জন্য অপরকে দোষারোপ করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। চলমান ও ঘটনাবহুল পৃথিবীর সঙ্গে যোগ হারিয়ে এঁরা তেমন ভাবে সামাজিক সংযোগ বা পারস্পরিক সংযোগ রেখে যেতে পারেন না, ফলে এঁদের মন অতীত জীবনকে কেন্দ্র করেই ঘুরতে থাকে। জীবনে কি পাওয়া গেল না, জীবনে কি করা হয়নি, কার কাছ থাকে কি পাওয়া উচিত অথচ পাওয়া হয়নি এসকল নিয়েই বুনে চলে চিন্তার জাল। এ বয়সে এঁদের যে পরিমাণ সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চাহিদা তা কোন রকমই পূর্ণ হয় না, বিকল্প হিসেবে এঁদের ভালবাসার অভাব পূর্ণ করতে হয় অতিরিক্ত খাদ্য দিয়ে। ফলে এঁদের খাদ্যের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়।

যৌন জীবনে প্রকৃতি এঁদের এনে দেয় অক্ষমতা, কিন্তু এদের পেছনে ফেলে আসা জীবনে, যৌন সুখের সাধ এঁরা পেয়েছেন, ফলে বার বার সে কথা এঁদের জীবনে এনে দেয় অশান্তি, সাধ আছে কিন্তু সাধ্য না থাকার গ্লানি।

এঁরা বর্তমানে অপারগ বলেই, এঁরা তাঁদের অতীত জীবনের যা কিছু

সাফল্যকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করতে চান, যাতে সকলের দৃষ্টি এঁদের দিকে আকৃষ্ট হয়। এঁরা পান থেকে চুন খসলে তা নিয়ে তুলকামাল কাণ্ড করেন। সামান্য অসুখকে বাড়িয়ে তুলে, তাদের অযোগ্যতা, ও অকর্মণ্যতার গ্লানি ঢেকে দিতে চান, চান অপর সকলের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়ুক। আর একটু ভালবাসা, যত্ন যেন দাবী রাখে তার অসুস্থ, ও বার্ধক্যে অসমর্থ দেহ। অপর দিকে কিন্তু এমনও দেখা যায় যে সকল প্রকারের ক্ষয়, ক্ষমতা ও শক্তির হ্রস্বতা সত্ত্বেও জীবনের পড়ন্ত বেলা, শেষ বেলার অস্তরাগের ন্যায় সুন্দর ও শান্তিময়। হিন্দু ধর্মের বানপ্রস্থের অবস্থার ন্যায় সকলপ্রকার আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতার হয় বিনাশ ও বিলোপ, নিজের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে লাগান হয় দেশের, সমাজের ও আপামর জনসাধারণের সেবা ও প্রয়োজনে।

আত্ম মূল্যায়নের হ্রাস (Self-devaluation)

মনের ইচ্ছা থাকলেও শরীরের শক্তি নাই, বাধ্য হয়েই সব কাজে কর্মে অন্যের সহায়তা নিতে হয়, এতে নিজের কাছে নিজেকে ও অত্যন্ত ছোট ও মূল্যহীন মনে হয়, অপরের ভার বোঝা মনে হয়। পরনির্ভরশীলতা মনকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। কিন্তু কিছু লোক আছে তাঁরা জীবনের সামনে কোন একটা বিশিষ্ট আদর্শকে ধ্রুবতারার মত স্থির লক্ষ্য হিসাবে রেখে এগিয়ে যান, এঁরা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে হীনমন্যতায় গ্লানি বোধ করেন না, যেমন ভীষ্ম, রবীন্দ্রনাথ, আইনষ্টিন (Einstein), ফ্রয়েড, টলষ্টয়, মোরারজী দেশাই, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। এরা বৃদ্ধ বয়সেও এঁদের উৎসাহ হারান নাই বা সমাজের কাজে বা নিজের কাজে মূল্যহীন হয়ে যাননি। বরঞ্চ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এঁরা সাহিত্য, সমাজনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান বা অন্যান্য কৃষ্টিগত জীবনে অফুরন্ত দান রেখেছেন। বার্ধক্য এলেই যে মানুষ ফুরিয়ে যায় না এঁরাই তার প্রমাণ।

প্রজন্মের ফাঁক ও ফারাক (Generation gap): নবীনের প্রগতির সঙ্গে প্রাচীনের স্থবিরতা ও রক্ষণশীলতা এনে দেয় দ্বন্দ্ব ও অসহিষ্ণুতা। বৃদ্ধের পুরানো হারিয়ে যাওয়া দিনের মূল্যবোধের প্রতি অযৌক্তিক কিন্তু অদ্ভুত মায়া, তার জন্য কি এক আকুতি। অন্যদিকে জীবনের যা কিছু নতুন

সমস্যা, যা কিছু চ্যালেঞ্জ তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার অদম্য প্রয়াস। সর্বদা নিজের চারদিকে একটা চিন্তা ভাবনা, অশান্তি ও অতীতের স্মৃতির জাল যেন এঁরা বুনে চলেন। এঁরা নিজেরা অতীতে যা কিছু করেছেন তার প্রতিদানে এঁরা চান এঁদের নিষ্কর্মা অলস জীবনে অসম্ভব সুখ সুবিধা। বর্তমানের সমালোচনায় ও অতীতের গুণগানে এঁরা মুখর। নিজের কর্মজীবন ও জীবনের বিভিন্ন কৌতূহল (Interest), বয়সের সাথে সাথে যত সীমায়িত হতে থাকে অলস চিন্তার জাল হয় তত বিস্তৃততর। পুরাতনের প্রতি দেখা দেয় একটা মোহ, যা কিছু অতীতের তাই ভাল এবং তাকে আঁকড়ে থাকবার একটা অদম্য চেষ্টা। লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনার বিষয় ও সময় ক্রমশঃই সীমায়িত হয়ে আসে এবং সকল কথার মাঝেই নিজের অতীত জীবনের গৌরবের কথা ও স্মৃতিচারণ এসে দেখা দেয়। একই কথার বারংবার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। কাজেই এদের সঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় একঘেয়ে বা Boring ও Monotonous: কিন্তু এঁদের ভিতরেই যাদের অতীত জীবন বহু বর্ণে, রঙে, অভিজ্ঞতায় চিত্রিত, এই বৃদ্ধ বয়সের জীবনকেও তাঁরা করে তোলেন রসপূর্ণ আনন্দঘন। যেমন শ্রীঅরবিন্দের দাদামশায় রাজনারায়ণ বসুর বৃদ্ধ বয়সে যখন তার পা-দুটি অচল ও অসাড় হয়ে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন তিনি কিন্তু সে অবস্থায়ও রস কৌতুকে ভরপুর ছিলেন। যাঁরা অতীত জীবনে ছিলেন স্বার্থপর, পরনির্ভরশীল, তাঁদের চাহিদার পরিমাণ, আত্মসর্বস্বতার পরিধি বৃদ্ধ বয়সেও বেড়েই চলে এবং এঁরা নিষ্ঠুর ভাবে বয়স্ক ছেলেমেয়েদের দোষ ত্রুটির আলোচনা করে চলেন, এমন কি অনেক সময় অভিশাপও দেন। নিজের অসহায় অবস্থার সুবিধা নিয়ে বাড়ির ছেলে মেয়েদের সন্ত্রস্ত করে তোলেন, চান তারা সব কিছু সুখ সুবিধা বিসর্জন দিয়ে, কেবল তাঁর কথাই ভাবুক।

প্রজন্মের দ্বন্দ্বের চরম প্রকাশের একটা দিক দেখিয়েছেন ফ্রয়েড তার oedipus complex বা ঈডিপাস গূঢ়ৈষার মতবাদে। সেখানে উঠন্ত বয়সের ছেলে বা মেয়ে, পিতা বা মাতাকে দেখে হিংসার চক্ষে, চায় তাদের সরিয়ে দিয়ে, তাদের অধিকার, সম্মান, সুখ-সুবিধা ও ভোগের সুযোগ সুবিধাকে করায়ত্ত করতে। এখানে ঠিক তার উল্টো, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, তরুণ-তরুণীরা স্বচ্ছন্দ সুখের ও ভোগের জীবনকে দেখে হিংসার সঙ্গে, চায় আবার কি করে,

পিছনে ফেলে আসা যৌবনের সুখ ও সম্ভোগের জীবনকে ফিরে পাওয়া যায়। দুঃখের সঙ্গে ভাবে "আমার হ'ল সারা, তোমার হ'ল শুরু।"

উর্বশীর চির যৌবন এরই ইঙ্গিত করে। অনাকাঙ্ক্ষিত বার্ধক্যকে দিতে চায় চিরনির্বাসন। যযাতি উপাখ্যানে আছে জরাগ্রস্ত, ভোগলিপ্সু, বৃদ্ধ পিতার যৌবনদীপ্ত পুত্রদের বয়সোচিত তারুণ্য ও ভোগ শক্তির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি ও কি করে তাকে নিজের জীবনে ফিরে আনা যায়, তার জন্য আকুল ও নিরতিশয় আকাঙ্ক্ষা। পূর্ব পুরুষের, উত্তর পুরুষের শক্তি, ক্ষমতা, স্বাস্থ্য, কর্ম ও কাম জীবনের প্রতি অদম্য আকর্ষণ। যযাতি ফিরে পেলেন তাঁর হৃত যৌবন, নিজের জরা তিনি চাপিয়ে দিলেন পুত্র পুরুর উপর, আর তার যৌবন তিনি নিয়ে নিলেন নিজে। বৃদ্ধের এই যৌবন ফিরে পাওয়ার আকুতিকে ফ্রয়েডের oedipus complex বা ঈডিপাস গূঢ়ৈষার ন্যায় যযাতি কমপ্লেক্স বা যযাতি গূঢ়ৈষা বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

অতীতের রোমন্থন (Rumination) ঃ অতীতের রোমন্থন বৃদ্ধ বয়সের যেমন অভিশাপ তেমন আশীর্বাদ। মন যখন এগিয়ে যেতে পারে না, দেহ যখন বিকল, তখন চলে অতীত জীবনের রোমন্থন, স্মৃতিচারণ, পিছনে ফেলে আসা অতীতের সব কিছু সফলতা বিফলতার কথাই ঘুরে ফিরে মনে আসে। জীবনে যা পাওয়া যায়নি তার হিসাব মিলাতেই মন তখন ব্যস্ত। অতীতের স্খলন পতন, দোষ ত্রুটি, অন্যায় পাপ, মিথ্যাচরণের কথা বারংবার মনকে পীড়া দেয়।

কাজ থেকে অবসর (Retirement) ঃ অবসর মানুষকে রূঢ়ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, রাষ্ট্রের, সমাজের, তার প্রয়োজনের দিন আজ ফুরিয়ে এসেছে। সে আজ অপ্রয়োজনীয়, কর্মে অনুপযুক্ত, সেজন্য তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নতুনকে বরণ করে নিয়ে এসে পুরাতনকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে। আজ মৃত্যুপথের পথিক সে, সংসার সমাজ থেকে বিদায় নিয়ে, সে মৃত্যুর অপেক্ষাতেই শুধু রয়ে যাবে। কালের রথ তার আপন বেগেই এগিয়ে যাবে। সেই কেবল আজ আর কালের অগ্রগতির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলতে পারবে না। এতদিনের সহকর্মীদের নিবিড় ও একান্ত সঙ্গ আর নাই, এতদিনের পরিচিত পরিবেশ থেকে সে আজ বিচ্ছিন্ন। এতদিনের অভ্যস্ত কাজের সে যাঁতাকলের চাপ আজ আর নাই, কিন্তু তার বদলে

দেখা দিয়েছে নিরবচ্ছিন্ন অবসরের শূন্যতা। এতদিনকার ঘড়ি ধরে চলা জীবনের হয়েছে ছেদ। আয়ের অঙ্ক নেমে গেছে অনেক নীচে। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে আজ দেখা দিয়েছে স্বামী-স্ত্রীর চব্বিশ ঘণ্টার একটানা সান্নিধ্যের জীবন, কিন্তু সেটাই কি আকাঙ্ক্ষিত? Bernard Shaw তো মনে করেন অবিচ্ছিন্ন দাম্পত্য জীবন মিলন মধুর নয়, এতে এসে যায় বিবাদ, বিসম্বাদ, মনোমালিন্য। মিলন ও বিরহের পালা বদলই দাম্পত্য জীবনকে মধুর ও বাঞ্ছিত করে তোলে। জীবনের গোধূলি লগ্নের বিস্মরণ ধীরে ধীরে ঢেকে দিতে থাকে জীবনের এতদিনকার সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে। অবসর গ্রহণের আগেই, ছেলে-মেয়েরা যদি লেখাপড়া শেষ করে, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তবেই বাবা নিশ্চিন্ত, অন্যথা এরাও অবসর প্রাপ্তের মনোজীবনে দুশ্চিন্তার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতাবোধ (Isolation) : কর্মজীবন থেকে অবসর, সমবয়সীদের মৃত্যু, প্রিয়জনদের মৃত্যু, জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর মৃত্যু এবং নিজের মৃত্যুর দিন যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, এসব নিয়ে ভয় ভাবনা, একটা নিঃসঙ্গতাবোধ থাকে। পরিচিত অনেকেই যখন ছেড়ে চলে যায় তখন নিজের বড়ই একা একা মনে হয়। ক্ষয়িষ্ণু যৌথ পরিবারে, আজ দাদু, দিদা ও নাতি-নাতনীর সম্পর্কের মধুরতাও আর নাই। এছাড়া ভবিষ্যতের অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে অনিশ্চিয়তা ও সম্পূর্ণ অজ্ঞতা (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে"), স্বর্গ, নরক, মোক্ষ, পাপ, পুণ্যের বিচার, আত্মার অমরত্ব, কত কিছু তার চিন্তা ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। তখন চলতে থাকে নিজেকে নিয়েই যা কিছু চিন্তা ভাবনা, সংশয়, সম্পূর্ণভাবেই আত্মকেন্দ্রিক জীবন, শোকে, দুঃখে অন্ধকার অজানা ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে হয়ে পড়েন মুহ্যমান। নিজের অতীতের কর্মমুখর জীবনের তুলনায় বার্ধক্যের দুর্বল অশক্ত পরনির্ভরশীল জীবন, মনের ভেতরটাকে গ্লানিময় ও স্পর্শকাতর করে তোলে। সময় কাটাবার জন্য ও নিঃসঙ্গতা এড়াবার কৌশল হিসাবে দেখা দেয় রেডিও শোনা, T.V. দেখা, ধর্মচিন্তা, ঈশ্বরচিন্তা, পুস্তক পাঠ এবং শক্তি থাকলে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শোনা। মৃত্যুর পরবর্তী কাল্পনিক বিভীষিকাময় অবস্থা থেকে ত্রাণের জন্য ও পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য, দান, ধ্যান, প্রার্থনা,

পূজা-পার্বণ, গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন প্রভৃতিতে অনেকে লিপ্ত হন। Jung (য়্যুঙ্) মনে করেন যে বেশীর ভাগ মনোরোগের মূল কারণই আজকের সভ্য সমাজের এই নিঃসঙ্গতাবোধ ও উপযুক্ত কর্মের অভাব।

নিদ্রাহীনতা (Insomnia) ঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবেই ঘুমের পরিমাণ কমে আসে, বৃদ্ধ বয়সে অনেকের আবার দেখা দেয় সম্পূর্ণ নিদ্রাহীনতা। বিনিদ্র রজনী ভরে থাকে অতীত জীবনের যা কিছু দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, যা হ'ল না কিন্তু হ'লে ভাল হ'ত, যারা কাছে থাকলে ভাল হ'ত, অথচ যারা কাছে নেই, এ সকল চিন্তা ভাবনায়। এ ছাড়া আর এক দল লোক আছে যারা রাত্রে নিজেরা ঘুমোতে না পারায়, অন্য যারা রাত্রে ঘুমোয়, তাদের হিংসা করে—এরা রাত্রে ঘরে ঘরে গিয়ে নানা প্রকার ছুতোয় সকলেরই ঘুম ভেঙ্গে দেয় এবং সারারাত ধরে সকলকে জ্বালাতন করে।

বৃদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যু (Death from old peoples angle of view) ঃ অনেকে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার বিষয়ের অজ্ঞতা ও অনিশ্চিয়তার ভয় পান, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। অনেকের জীবনে আবার মৃত্যু খুবই আকাঙ্খিত মুক্তি, যারা জীবনের সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন, বহু নিকটজনের মৃত্যু শোকের আঘাতে মুহ্যমান, জীবন যাদের কাছে অর্থহীন, ব্যথা-বেদনাপূর্ণ ভরা বোঝা মাত্র। অপর দিকে আবার একদল ধর্মবিশ্বাসী দার্শনিক আছেন, যারা বিশ্বাসের আলোয়, ইহকাল, পরকাল, সব কিছুতেই পরম বিশ্বাস ও নির্ভরতারই যেন ইশারা পান। স্পিনোজা (Spinoza) যেন কতকটা হিন্দুদের গীতার ন্যায় জীবন মৃত্যুকে এক বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। জীবনভোর যথাকর্তব্য শেষে, মৃত্যুর মধ্যে পরম বিশ্রামের কল্পনাও কেউ কেউ করেছেন।

প্রকৃতির সামগ্রিক পরিকল্পনায় জীবনশেষে যে মৃত্যু তাকে কিন্তু পূব ও পশ্চিম ভিন্নতর দৃষ্টি কোণ থেকে দেখেছে—পূব বলেন :

"অব্যক্তাদিনি ভূতানি, ব্যক্ত মধ্যান্ত ভারত
অব্যক্তনিধান্যেষ তত্র কা পরিদেবনা"

—গীতা

অথবা জীবন শেষে জীবাত্মা নিঃশেষে পরমাত্মায় মিলিয়ে যাবে, হবে পরম মোক্ষ বা নির্বাণ। পশ্চিমে চলে ব্যক্তিত্বের পূজা, কালের গতির সঙ্গে আমিও চলেছি এবং প্রকৃতিকে আমার ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তিত করেছি ও করব। বার্ধক্য ও মৃত্যু এসে আমার সেই ব্যক্তি সত্তার ছেদ টেনে দেবে এ যে অসহ্য। আমাকে বাদ দিয়েই পৃথিবী চলবে পশ্চিমের লোকের কাছে এ ধারণা মেনে নেওয়া কষ্টকর। সে জন্যই ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবি যখন মৃত্যুকে আহ্বান করে বলেন "মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান"। তখন পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ কবি বলেন :

"All our yesterday have lighted fools
The way to dusty death : out, out brief candle !
Life's but a walking shadow, a poor player
That streets & frets his hour upon the stage,
And then is heard no more : it is a tale
Told by an idoit, full of sound & fury,
Signifying nothing."

পশ্চিমের মনোবিজ্ঞানী Kubler Ross, বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে মৃত্যুকে দেখতে চেয়েছেন। তিনি মৃত্যুর অমোঘ পদক্ষেপে যে ৫টি স্তর দেখতে পেয়েছেন সেগুলি মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধের মনে আশার সঞ্চার করবে ও সান্ত্বনা দেবে।

প্রথম স্তর : মৃত্যুপথ যাত্রী, মৃত্যুর সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তার মৃত্যু অসম্ভব বলে মনে করেন।

দ্বিতীয় স্তর : জীবনের ছেদকে অন্যায় ও অযৌক্তিক মনে করে রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তৃতীয় স্তর : মৃত্যু যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ততই মনে দেখা দেয় ভয়। মনে মনে সে হয় অনুতপ্ত এবং মনে মনেই প্রতিজ্ঞা করে এ যাত্রা যদি বেঁচে যাই, তবে সৎপথে চলব, ধর্মপথে চলব, কারো ক্ষতি আর জীবনে করব না।

চতুর্থ স্তর : যখন সে বুঝতে পারে কিছুতেই আর রক্ষা নাই, তখন তার মন দুঃখ অবসাদ ও একটা অসহায় ভাবে ঢেকে যায়।

পঞ্চম স্তর : কিন্তু মৃত্যু যখন তার শীতল স্পর্শে মৃত্যু যাত্রীকে আচ্ছন্ন

করে দেয় তখন ধীরে ধীরে মন থেকে সব সংশয়, আকর্ষণ, পৃথিবীর সব কিছু বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি টান বা ভালবাসা শিথিল হয়ে আসে—একটা পরম শান্তি সমস্ত মনটাকে ঢেকে দেয় এবং পরম শান্ত ভাবেই মৃত্যুকে তখন সে গ্রহণ করে।

বৃদ্ধ বয়সে মনের নানাপ্রকার চিন্তা ভাবনা ও মাত্রাতিরিক্ত ভাবাবেগের বিরুদ্ধে রক্ষা কবচ বা Defence mechanism: হিসেবে দেখা দেয়—

(১) বাস্তবকে অস্বীকার করার একটা অপচেষ্টা। নিজের যে আর যৌবন নাই। বার্ধক্য এসে গেছে, মন থেকে এ ভাবনাকে দূরে সরিয়ে রাখা বা বিচ্ছিন্ন করা। দরকার মত চিকিৎসা বা কাজের চাপ এরা কমিয়ে আনে না। কিন্তু এর ফল শেষে ভাল হয় না, কারণ বার্ধক্যকে অস্বীকার করেই কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না।

(২) অনেক সময় আবার এরা নিজেদের স্বকীয় মানসিক চিন্তা ভাবনার কারণ হিসাবে বাইরের কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপর দোষারোপ করতে আরম্ভ করেন। যেমন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হাঁপিয়ে পড়লে, বলেন—এ সিঁড়িটা এত খাড়া, এ দিয়ে কোন ভদ্রলোক উঠতে পারে না। এরা চোখে কম দেখেন ও কানে কম শোনেন বলে সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখেন, কি দোকানদার, কি আত্মীয় স্বজন সবাইকে—এর ফলে অকারণে সবার উপর রেগে থাকেন।

(৩) অনেক সময় আবার সকল কাজে কর্মে শিশু সুলভ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নিজে সত্যিকারের যতটা অপারগ, বাইরে সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেক বেশী করে দেখান।

(৪) অনেক সময়ই পিছন ফিরে তাকান অতীত জীবনের দিকে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন "হায়রে সেকাল"।

বৃদ্ধরা কি চায় (১) যতদিন বেঁচে থাকব যেন নিজের ওপরই নিজে নির্ভর করে চলতে পারি। মনের দিক থেকে যেন অন্যের নির্দেশে না চলতে হয়। থাকে যেন সক্ষম থেকে নিজের ব্যবস্থা করে যাওয়ার মানসিক পরিবেশ ও প্রস্তুতি।

(২) আত্মসম্মান রেখে যেন পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারি। সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মধ্যমণি থেকে সরে গিয়ে যেন অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের বস্তু হয়ে পৃথিবী থেকে চলে যেতে না হয়।

(৩) চলমান জীবনের সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত যেন সমান তালে চলতে পারি, যেন মিলিয়ে যাওয়ার আগেই না মনে হয় আমি ফুরিয়ে গেছি। টবের ভেতরে যেমন ফুল গাছকে ধরে রাখতে হয় তেমনি আমি "দেখন শোভা হয়েছি।"

———

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত
বিজ্ঞান পুস্তিকা

পাঁচ টাকা